BANGLADESH BUREAUCRACY:
AN IMPEDIMENT TO ITS ECONOMIC GROWTH

Dr. A-K Abdul Momen

PUBLISHED BY:
DEWAN ABDUL BASET
Marupalash GROUP OF PUBLICATIONS
DHAKA, BANGLADESH

FIRST EDITION
*Marupalash*_(BOIPOTRO) GROUP OF PUBLICATIONS, DHAKA
BANGLADESH
APRIL 2002

INTERNET EDITION

NOVEMBER 2002

COMPUTER COMPOSE
LUBNA BASET BRISHTI

Contact with writer

E-MAIL: marupalash@yahoo.com

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রতিবন্ধকঃ আমলাতন্ত্র

ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেন

প্রকাশক:

দেওয়ান আবদুল বাসেত
মরুপলাশ (বইপত্র) গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ ।

প্রথম প্রকাশ:
এপ্রিল-২০০২

দ্বিতীয় প্রকাশ:
ইন্টারনেট এডিশন
নভেম্বর ২০০২

গ্রন্থ স্বত্ত্ব:
লেখক

কম্পিউটার কম্পোজ:
লুবনা বাসেত বৃষ্টি

লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ :

E-mail : marupalash@yahoo.com

Published by: Marupalash (Boipotro) Group of Publications
Dhaka, Bangladesh

উৎসর্গ

যে সব প্রবাসী বাঙালি ভাইবোনদের শ্রমের ফসলে বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে, সেই সব খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে.......লেখক

ডঃ এ-কে আব্দুল মোমেন

ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেন সউদী আরবে একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে কর্মরত আছেন। ইতিপূর্বে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বষ্টনে ব্যবসা প্রশাসন ও অর্থনীতির একজন সুদক্ষ অধ্যাপক ছিলেন। স্বদেশ ত্যাগ করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিবাস নেবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সরকারে কাজ করেন। বাংলাদেশের ওয়েজ আর্নাস স্কীম এর উদ্যোক্তা ডঃ মোমেন আন্তর্জাতিকভাবে নারী ও শিশু পাচার বন্ধে যে অবদান রাখেন, তারই স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে হিউম্যান রাইট্স- ১৯৯৪ এওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। এ ছাড়া তিনি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ব্যক্তিগত প্রশংসাও অর্জন করেন। তিনি একজন তত্ত্ব ও তথ্যমূলক প্রবন্ধকার হিসেবে দেশে বিদেশে এক বিশাল পাঠক প্রিয়তা পেয়েছেন। তিনি রিয়াদের **মরুপলাশ**, **মোহনা**, **রূপসী চাঁদপুর**, এবং **অন্যধারা** সাহিত্য পত্রে নিয়মিত লেখালেখি করেন এবং দেশের জনপ্রিয় দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সংবাদ এবং ইংরেজি **ইনডিপেন্ডেন্ট** ও **ডেইলী ষ্টার** এ তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি আমাদের সে কথাই মনে করিয়ে দেয়।

তাইতো বলতে ভালো লাগে সউদী আরবে ডঃ মোমেন শুধুমাত্র একটি নামই নয়, একটি প্রতিষ্ঠান ও বটে। একজন অনন্য প্রতিভাবান, নিরহংকার এবং একজন সদালাপী মানুষ তিনি। চিরতরুণ, চিরসবুজ এক বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও একজন নিখাদ বাঙালি ডঃ মোমেনকে নিয়ে এই বিভূঁই প্রবাসে আমরা অহংকার করতে পারি।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মরুপলাশ
প্রধান সম্পাদক, মোহনা, রূপসী চাঁদপুর
E-mail: marupalash@yahoo.com

প্রবন্ধ ক্রমঃ

(১) বাংলাদেশ আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়
(২) একুশে ফেব্রুয়ারী ও নতুন শপথের ডাক
(৩) বাংলাদেশের সমস্যাঃ সন্ত্রাস, বিচার বিভাগ...
(৪) বাংলা নববর্ষঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
(৫) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত
(৬) বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বোস্টনের ভূমিকা
(৭) হরতাল ধর্মঘট ও রাজনৈতিক দায়িত্বহীনতা
(৮) বাংলাদেশ ও আমেরিকাঃ দুই দেশে দুই নিয়ম
(৯) বাংলাদেশ ও সৌদি আরবে ধর্মের আদব-কায়দা
(১০) মণীষী উপাখ্যান (ছোট্ট বন্ধুদের জন্য একটি বিশেষ রচনা)

বাংলাদেশ আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়

বাংলাদেশের ৩০তম জন্মদিবসে বাঙালির গর্ববোধ করার অনেক কিছুই আছে। জাতি আজ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিন্জারের 'তলাবিহীন ঝুড়ি' (বোটমলেস্ বাস্কেট) আর নয়। সে বদনাম গুছিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বার্ষিক মাথাপিছু আয় পৃথিবীর ত্রিশটি দেশ থেকে ও অধিক এবং পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ৫৫টি মুসলিম দেশসমূহের ৪৭টি দেশসমূহের বার্ষিক জিডিপি বাংলাদেশ থেকে কম। এমনকি তৈল সম্পদে ভরপুর নাইজিরিয়া, আলজেরিয়া, মরোক্ক বা সিরিয়ার বার্ষিক জিডিপি থেকে বাংলাদেশের জিডিপি অধিক। এর বার্ষিক মাথাপিছু আয় ১৬টি মুসলিম দেশ থেকেও অধিক।

১৯৭০ সালে দেশের শতকরা প্রায় ৭০% ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নিচে জীবনযাপন করছিলো, এখন তা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। আরো সুখের কথা তখন দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিলো ২৪% ভাগ, এখন তা প্রায় ৬০% ভাগে এবং দেশে জীবনের আয়ু ৩৩ বছর থেকে প্রায় ৬০ উত্তীর্ণ হয়েছে। এগুলো গর্বের কথা। আশ্বাসের কথা। বর্তমানে দেশের প্রায় ৯০% ভাগ লোক বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুযোগ পাচ্ছে - এ অবস্থা অনেক ধনীক দেশ থেকেও উত্তম। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্রাজিল (৬৯%), কোরিয়া (৮৩%), পাকিস্তান (৬২%) কলম্বিয়া (৮৫%) একুয়েডর (৬৮%) এবং ইন্দোনেশিয়াকেও (৬২%) হার মানিয়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্র নিরসনে, শিক্ষা প্রসারে, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা সৃষ্টিতে এবং পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রনে দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বা এন-জি-ও রা যে ভূমিকা রেখেছে তা বিশ্বে আদর্শ স্থানীয়। বাংলাদেশের 'গ্রামীণ ব্যাংক' 'ব্রাক' 'আশা' 'প্রশিখা' ইত্যাদি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধু দেশের সম্পদ নয়, দারিদ্র নিরসনে ও মহিলাদের আত্নপ্রত্যয় এবং জীবনে প্রতিষ্ঠার বাহক হিসাবে আদর্শ স্থানীয় - এরা যে কর্মসুচী সফল করেছে তা জাতির জন্যে গর্বের বস্তু ।

বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণে, খাদ্য উৎপাদনে,ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানে, উইম্যান এমপাওয়ারমেন্টে, নারী জাগরণে, মাতৃভাষার সম্মান অর্জনে, বিশ্বে শান্তির দূত হিসেবে, এবং জাতি সংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে যে ভূমিকা রেখেছে তার জন্যে সম্মিলিত জাতিসংঘের একাধিক অংগ প্রতিষ্ঠান থেকে 'আদর্শ মডেল' হিসাবে পুরস্কার বা এওয়ার্ড পেয়েছে বার বার। জাতির জন্যে তা নিশ্চয়ই গর্বের বিষয়।

বাংলাদেশের প্রতিকূল আবহাওয়া, অনাবৃষ্টি, প্লাবণ, দূর্যোগ, অস্বাভাকি ঘনবসতি, প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা, শিক্ষার নিমন্মান, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় গোড়ামী বা ধর্মান্ধতা - এতসব সমস্যা জর্জরিত দেশও যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপূর্ব সফলতা দেখাচ্ছে বা অর্জন করতে সফল হয়েছে তাতে অনেককেই অবাক করেছে।

বাংলাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্যে নির্দ্দলীয় সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টি, আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান, লোকক্ষয় ও এথনিক ক্লিনজিং বন্ধের জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষর এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান বিশেষ করে 'গঙ্গার পানি চুক্তি' সম্পাদন - এ সমস্ত সরকারী সাফল্য বিশ্ববাসীর সম্মান অর্জনে সাহায্য করে। লক্ষ্যনীয় যে গেল চার বছরে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের নিবন্ধনকৃত সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯.৮ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৫৫ হাজার কোটি টাকা এবং সর্বমোট নিবন্ধকৃত বিনিয়োগের পরিমান হচ্ছে ১৭ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৮৫ হাজার কোটি টাকা। গেল ৩০ বছরে বাংলাদেশ ৩৪ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান গ্রহন করেছে এবং গেল বছরে ১৭ বিলিয়ন অর্থাৎ ৩০ বছরে যা অর্জন করেছে তার অর্ধেক গেল বছরে 'নিবন্ধকৃত' হয়েছে - তা প্রমান করে যে,স্বদেশে অনেকেই বিনিয়োগ করতে আগ্রতী।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান গেরী একারম্যান এবং স্টীভেন ক্রাউলী যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে 'বাংলাদেশ ফোকাস্' নামে দ্বিপক্ষীয় কমিটি তৈরী করেছেন এবং ছয়জন কংগ্রেসম্যান এর সদস্য। তারা বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ও ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় দেখে এ ফোকাসটি তৈরী করেছেন। তারা বলেছেন যে, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ একটি 'মডারেট' দেশ এবং এটা দ্বিতীয় বৃহত্তম গনতান্ত্রিক মুসলিম দেশ। তারা বলেছেন যে, ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার মাত্র ২৫ মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে এবং বর্তমানে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭২৫ মিলিয়নে - এর অর্থ হচ্ছে ঐ দেশের প্রতি ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস বেড়েছে।

বাংলাদেশের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে দেখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন উভয় দেশের সম্পর্ক গভীরতর করার জন্য, এই সর্বপ্রথম বাংলাদেশ সফর করেন। এটা বর্তমান সরকার ও এন, জি, ও দের কৃতিত্ত্ব। বর্তমান হাসিনা সরকার বন্ধুসুলভ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহন করায় এবং বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্যে উদাত্ত আহবান করায় বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এসেছেন। যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর, ভারত, দক্ষিন কোরিয়া ও জার্মানী যথাক্রমে ২১৮৩ মিলিয়ন, ১২৯৩ মিলিয়ন, ১১৩১মিলিয়ন, ৮৯০মিলিয়ন,

৮০০ মিলিয়ন, ৫২০ মিলিয়ন, ৩৫০মিলিয়ন, ২৭৮মিলিয়ন, ও ২২১ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। যে কোন দেশের জন্যে এ অবস্থা গর্বের বিষয়। তবে দুঃখের বিষয় এইযে, এই বিরাট অংকের শতকরা ৩% ভাগও সত্যিকারভাবে বিনিয়োগ হয়নি প্রধানতঃ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দূর্ণীতি, মাস্তানবাজী, এবং হরতাল-ধর্মঘটের জন্যে। বাংলাদেশে 'নিবন্ধনকৃত' বিনিয়োগের পরিমান হচ্ছে ১৬১৭৬ মিলিয়ন ডলার। প্রতি মিলিয়নে গড়ে বাংলাদেশে উন্নতমানের ২০৬ টি চকুরী সৃষ্টি হয় এবং এই হিসাবে এই 'নিবন্ধনকৃত বিনিয়োগ' সত্যিকার ভাবে বিনিয়োগ হলে স্বদেশে অতিরিক্ত ৩৩ লক্ষ ৩২ হাজার নতুন চাকরি সৃষ্টি হতো।

দেশে আজ বেকার সমস্যা এবং এরফলে গেল দশবছরে দেশের প্রায় ২২ লক্ষ যুবক প্রবাসে পাড়ি দিয়েছেন জীবিকার অন্বেষনে। যদি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দূর্ণীতি কমানো যেতো তাহলে ৩৩লক্ষ না হোক, ২৫ লক্ষ নতুন চাকরি সৃষ্টি সম্ভব ছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, এ ব্যাপারে সরকার এখনো যথেষ্ট সজাগ নন এবং এরফলে ম্যানুফেকচারিং প্রবৃদ্ধি বা শিল্পায়ন কম হচ্ছে। ১৯৯১-৯৬ সালে যেখানে ম্যানুফেকচারিং বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.৪% ভাগ তা বর্তমান সরকারে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৬% ভাগে। (বাংলাদেশের বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০০। অর্থ মন্ত্রনালয়) বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা এজন্যে দায়ী করেছেন অর্থমন্ত্রনালয়ের নীতিমালাসহ দূর্ণীতি, মস্তানবাজী, হরতাল-ধর্মঘট, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, ও আইন শৃংখলার অবনতিকে। এসব বিষয়ে সরকারকে মনোযোগী হতে হবে। নতুবা শিল্পায়ন সম্ভব নয় এবং চাকরি সৃষ্টিও সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে মাত্র ৭% ভাগ লোক শিল্পক্ষেত্রে কাজ করে এবং ৬৩% ভাগ কৃষিকাজে নিয়োজিত।

কৃষিকাজ ও তৈরী পোষাক শিল্প সরকারী আমলার সরাসরি নিয়ন্ত্রন না থাকায় উক্ত ক্ষেত্রসমূহে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশের গারমেন্টস্ শিল্পের অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধি বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, মোরিসাস্, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ব্রাজিল, মিশর, তিউনিশিয়া, মেক্সিকো স্পেন, জামাইকা, প্রভৃতি দেশকে হার মানিয়েছে। মোটকথা, বাঙালিরা সুযোগ পেলে কাজে সাফল্য অর্জনে বদ্ধ পরিকর। এতসব হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট সত্ত্বেও অধিকাংশ গারমেন্ট ব্যবসায়ী তাদের 'অর্ডার' যথাসময়ে সরবরাহ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং সেই সাথে দেশের গর্ব বর্ধিত করেছেন।

কৃষিক্ষেত্রে খালেদা জিয়া সরকারের মতো সার কেলেংকারী না করায় এবং আল্লার অশেষ কৃপায় বন্যা-অতিবৃষ্টি-প্লাবন-খরা কম হওয়ায় বর্তমান সরকার ১৯৯১-৯৬ সালের সরকার থেকে গড়ে ২০ গুণ বেশী খাদ্যশষ্য উৎপাদন করে খাদ্যে স্বয়ংস্বপূর্ণতা অর্জন করেছেন। ১৯৯১-৯৬ সালে কৃষিক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ০.১৮% ভাগ। হাসিনা সরকারে তা বেড়ে গিয়ে দাড়ায় ৩.৪৮% ভাগে। এই বিরাট সাফল্যের পেছনে গঙ্গার পানিচুক্তি ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মোট কথা হচ্ছে যেখানে আমলাতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা কম যেমন গারমেন্টস্ শিল্প, কৃষিক্ষেত্র ও এন-জি-ও কর্মকান্ড- সেই সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন অত্যন্ত গৌরবের। সুতারাং রাজনীতিবিদদের কাছে প্রশ্ন- আমলাতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা কি কমাবেন?

এখানে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন বোধ করি। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসিত হয় সামরিক ও আধা সামরিক সরকারসমূহ দ্বারা। আর ১৯৯১-থেকে ১৯৯৬ সাল খালেদা জিয়া দেশ শাসন করেন। এই ২১ বছরের সরকারসমূহ 'ভারত গঙ্গার পানি নিয়ে যাচ্ছে বলে বাংলাদেশ মরুতে পরিনত হচ্ছে' 'ফারাক্কা আন্দোলন, জাতি সংঘে বিষয়টি একতরফাভাবে বার বার উত্থাপন করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটেছেন যথেষ্ট, কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। বরং ভারত বিরোধী মন-মানসিকতা সৃষ্টিতে তা যথেষ্ট সাহায্য করেছে। দীর্ঘ ২১ বছর যে সমস্যার সমাধান আমলানির্ভর সরকারসমূহ সমাধান করতে পারেননি তা হাসিনা সরকার স্বল্পদিনের মধ্যে অভাবনীয়ভাবে সমাধা করে বিশ্ববাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছেন অজস্র। একথা অতিরঞ্জিত হবেনা যে,ভারতের সাথে 'পানিচুক্তি' সম্পাদনে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শান্তিচুক্তি' সম্পাদনে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সমকক্ষতা অন্য কেউ করতে পারেন নি। তাছাড়া বয়স্কভাতা, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে ভাতা, আশ্রায়ন, গৃহায়ন - ইত্যাদি প্রকল্প বর্তমান সরকারের সাধারণ গরিব জনগনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রকাশ করে। এসব ব্যাপারেও তারা অগ্রনী এবং প্রশংসার দাবীদার।

বর্তমান হাসিনা সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন তার কয়েকটি দিক আলোচিত হয়েছে। তবে দুটো ক্ষেত্রে আরো অধিকতর তৎপরতা প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রগুলো অংগাঙ্গীভাবে জড়িত। এসব ক্ষেত্র হচ্ছে প্রথমতঃ সন্ত্রাস ও দূর্ণীতি দূরিকরণ এবং দ্বিতীয়ত প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগের উন্নয়ন এবং শিল্পক্ষেত্রে জোর প্রধান।

বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ হচ্ছে ‘মানুষ ও পানি’। এই মানুষ ও পানি কিভাবে দেশ উন্নয়নের কাজে লাগানো যায় সে ধরনের সরকার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। একথা স্বীকার্য যে, বাংলাদেশের প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নয়নের উপযোগী নয়। কারণ বাংলাদেশের পাশা পাশি রাষ্ট্রসমূহ যেমন- থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, চীন - ইত্যাদি দেশের বার্ষিক জনপ্রতি আয় বাংলাদেশ থেকে কয়েক গুণ বেড়েছে - এবং এরফলে তুলনামূলক ভাবে বাংলাদেশীর ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। অত্র অঞ্চলের গেল ৩০ বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আমাদের আমলাতান্ত্রিক কাঠামো দেশ উন্নয়নের উপযোগী নয়।

দেশের দূর্ণীতি, সন্ত্রাস, বিচার না পাবার আশংকা, শিল্পে অনগ্রসরতা এবং আইন শৃংখলার অবনতি -এ সবের মূলে রয়েছে ত্রুটিযুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো। বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোতে ‘জবাবদিহিতার’ ব্যবস্থা নেই, পারদর্শিতা ও সততার পুরস্কার নেই, নেই দূর্ণীতি বা অপকর্মের শাস্তি এবং এরফলে বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো জনগনের বন্ধু নয়, সেবক নয়, বরং অত্যাচারী স্বার্থলিপ্সু শাসক। রাজনৈতিক সরকার সমূহ যদি এই কাঠামোর পরিবর্তন না করেন তাহলে তারা তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যর্থ হবেন এবং জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন।

বিভিন্ন গবেষনায় দেখা গেছে যে, কোনো একক কোম্পানী বা সংস্থার উন্নয়নের জন্যে উন্নত ‘প্রযুক্তি বিদ্যা’ যেমন উন্নয়নের প্রধান সোপান, একইভাবে জাতির উন্নয়নের জন্যেও উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যা সমভাবে অত্যাবশ্যকীয়। উন্নত প্রযুক্তি ছাড়া দেশ উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বর্তমান প্রচলিত প্রশাসনিক কাঠামো উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির পরিপন্থী। সুতরাং একে ঢেলে সাজাতে হবে।

‘প্রযুক্তি বিদ্যা’ বলতে শুধুমাত্র মেসিন, কম্পিউটার বা অটোমেশনকে বুঝায় না - প্রযুক্তি বিদ্যা রীতি-নীতি, কর্মপদ্ধতি, নিয়োগ-বদলি, প্রমোশন-বরখাস্ত, বিভিন্ন কর্মচারীর দায়-দায়িত্ব, নিয়োগের নিয়মাবলী, কর্ম সম্পাদনের পদ্ধতি অর্থ্যাৎ জ্ঞানপ্রসূত রীতি-নীতি কর্মপদ্ধতি সবকিছুই ‘প্রযুক্তি বিদ্যার’ অংগ বিশেষ। সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্যে এর সন্ত্রাস, দূর্ণীতি ও হরতাল কমানোর জন্যে এর বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্যে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা কমানোর জন্যে অথবা দেশের সার্বিক কল্যানের জন্যে প্রয়োজন প্রশাসনিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। কি ধরনের পরিবর্তন অত্যাবশ্যকীয় তা ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রবন্ধে সবিস্তারে পেশ করা হয়েছে। মোটকথা, আমার প্রস্তাবিত ‘নির্বাচিত সরকার’ ব্যবস্থার মাধ্যমেই* বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ‘সোনার বাংলা’ অর্জন সম্ভব। যত তাড়াতাড়ি রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সরকার এ বিষয়ে এগিয়ে আসবেন ততই দেশের মঙ্গল।

একুশে ফেব্রুয়ারী ও নতুন শপথের ডাক

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল জনগনের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জন এবং একে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। সে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং এ জন্যে আজ স্বাধীন বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানে নগ্ন-পায়ে কালো ব্যাজ পরে শহর প্রদক্ষিণ করার পরিবর্তে কিভাবে বাংলাকে এবং বাংলা ভাষাভাষীকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্টত্বের আসনে সমাসীন করা যায় সে নিয়ে আলাপ-আলোচনা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অনুরূপ উৎসবের আয়োজন করা সমীচিন বলে মনে হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলার গৌরবের দিন। নিজেদের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বরকত সালামের খুনে ঐদিন ঢাকার রাজপথ হয়েছিল রক্তরাঙা।জনগন পুলিশের গুলী আর টিয়ারগ্যাসকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজেদের জন্মগত অধিকার আদায়ের রক্ত শপথ গ্রহণ করে এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। আজ একুশে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপনের দিনে যে জিনিষটি সবচেয়ে মুখ্য তা হচ্ছে, একুশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের দিক নিদর্শণ করা।

একুশের আন্দোলন ব্যাপক অর্থে স্বাধীকারের আন্দোলন- নিজেদের প্রাপ্য দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাই যদি হয় তাহলে আজকের বাংলাদেশে যেখানে দেশের জনগোষ্ঠি গুটিকতেক আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তির হাতে জিম্মি জীবন-যাপন করছেন, সেখানে জনতার আশা-আকাঙ্খা, জীবনের নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত, যেখানে জনতার নামে অর্জিত বৈদেশিক সম্পদ গুটিকতেক সুখ আহ্লাদের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, যেখানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, ঘরের মালিক ও দাস-দাসীর মধ্যে ক্রীতদাসের মতো জীবন ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে দেশের সম্পদ ধনিক শ্রেণী ব্যবসার নামে পুকুরচুরি করে বৃহত্তর জনগনকে দেউলিয়া করে রাখছে, এমন সমাজ জীবনে আজকের একুশের প্রেরণা হবে এমন জিম্মি অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে নতুন শাসনতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক জীবন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে স্থানীয় নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন।

এমন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্থানীয় জনগন কাকে স্থানীয় প্রশাসনিক অফিসার নিয়োগ করা হবে, কাকে শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা হবে, কাকে করা হবে হেল্‌থ অফিসার, কোথায় নতুন স্কুল, কলেজ বা রাস্তাঘাট নির্মিত হবে এবং এসব পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রনের জন্য কত টাকা কর হিসাবে আদায় হবে সাংবিধানিক দায়িত্বে থাকবেন। তার ফলে কেউ যদি

স্থানীয় জনগনের উন্নয়নে বিমুখ হন বা জনগনের সেবায় মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ না হন কিংবা কেউ যদি ঘুষ-চুরি ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় জনগনের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলেন, তাহলে স্থানীয় জনগন তাকে শুধু বরখাস্ত করার অধিকার রাখবেন না, তাকে উপযুক্ত শাস্তির জন্যে কোর্টের কাছে সোপর্দ করবেন। যদি কোন ব্যক্তি-বিশেষ স্থানীয় জনগনের উন্নয়নে বিশিষ্টতা অর্জন করেন ।

তাহলে স্থানীয় জনগন তাকে অধিকতর বেতন বা ভাতা প্রদান করবেন এবং এমতাবস্থায় অন্যান্য স্থানীয় সরকার সমূহ উপযুক্ত লোকদের নিয়োগ করার জন্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারেন। এমন অবস্থায় উপযুক্ত ব্যক্তি বিশেষকে মর্যাদা দেয়া হবে, কর্ম-কুশলতাকে মর্যাদা দেয়া হবে-উপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক ক্যাডার বা চাকুরির সিনিয়রিটিকে প্রাধান্য দেয়া হবে না। এতে করে সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে, ঘুষ-চুরি কমবে, জনগনের জিল্লতি কমবে, জীবনের নিরাপত্তা বাড়বে এবং সর্বোপরি গোটা দেশবাসীকে গুটিকতেক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং উর্ধ্বতন কর্মচারীর হাতে জিম্মি থাকতে হবে না।

নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উপযুক্ত যোগ্য লোকের প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং একই সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লক্ষ কোটি জনতাকে নিজদের স্ব স্ব এলাকা গড়ে তোলার জন্যে অংশীদার করা সম্ভব। বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ঢাকা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের জনগন নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত নন বিধায় সারা দেশজুড়ে সরকার ও জনগনের মধ্যে বিরাট ফারাক তৈরী হয়েছে।

জনগনই সকল শক্তির আধার, সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টার বাহক এবং স্রষ্টা। সুতরাং জনগনকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগাতে হবে। উল্লেখিত নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় দেশের সকল অঞ্চলের জনগনকে দেশ গড়ার কাজে, নিজেদের এলাকা বা অবস্থার উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। আজকের একুশে ফেব্রুয়ারীর ব্রত হওয়া উচিত অনুরূপ এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে রক্ত শপথ গ্রহণ করা। তাহলেই বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্টত্বের আসনে সমাসীন হতে পারবে- বাংলা এবং বাঙালি জাতি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হবে বলে আমার বিশ্বাস। (বস্টন, ম্যাসাচুসেটস, ১৯৯৬)

বাংলাদেশের সমস্যাঃ
সন্ত্রাস, বিচার বিভাগ, বেকারত্ব ও দূর্ণীতি

তখন মনে হয় ১৯৭৭ সাল। তেহরানের খাক্ প্রাসাদে আমরা তখন রাজকীয় অতিথি। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি চীপ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল জিয়াউর রহমান জিজ্ঞেস করলেন- 'বাংলাদেশের এক্চুয়েল লোক সংখ্যা কত এবং দেশের কতটি ইউনিয়ন কাউন্সিলে নির্বাচন হচ্ছে'? বিকেলে উনার সাংবাদিক সম্মেলন এই প্রাসাদেই। বল্লাম- 'স্যার লোকসংখ্যাতো দুই প্রকার, কোন্টা বলবো?' তৎকালীন অর্থ উপদেষ্টা ডঃ এম, এন হুদা বাঁধা দিয়ে বল্লেন-লোকসংখ্যা দুই প্রকার - এর অর্থ কি? বল্লাম- স্যার একটা বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্য নেয়ার জন্যে মাথা গননা যার সংখ্যা হচ্ছে ৮১ মিলিয়ন এবং অন্যটি হচ্ছে যাদের জন্যে সরকারের সব আইন-কানুন, সুযোগ-সুবিধা তৈরী হয়, যাদের জন্যে সরকারের সব সম্পদ ব্যয়িত হয় এবং এদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র দশ হাজার। এবারে দেশে গিয়ে দেখলাম এ সংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে- বর্তমানে তা বেড়ে গিয়ে প্রায় দশ লক্ষতে দাঁড়িয়েছে। গারমেন্টস্ শিল্প ও এপার্টমেন্ট ডিভালাপারদের কারণে এবং গেল কয়েক বছরে মন্ত্রনালয়ের সংখ্যা ২১ থেকে ৩৫টি এবং দপ্তরের সংখ্যা ১০৯ থেকে ২২১টিতে বর্দ্ধিত হওয়ার সাথে সাথে দেশে সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা সাড়ে ৪ লাখ থেকে বেড়ে গিয়ে প্রায় ১২ লক্ষতে পৌছেছে।

এর ফলে দেশের সম্পদ এখন অনেকের হাতে পৌছার সুযোগ হয়েছে; যার ফলে 'আসল লোক সংখ্যার'' পরিমানও কয়েকগুণ বেড়েছে। এখন এয়ারপোর্টের 'ভি-আই-পি রুমে অনেক অপরিচিত লোকের সমাগম ঘটে। এক সময় ছিল যখন ভি-আই-পি রুমের প্রত্যেকে প্রত্যেককেই চিনতেন-সেদিন পাল্টিয়েছে। এখন অন্য অবস্থা। এখানে বলে রাখা সঙ্গত যে বাংলাদেশের ভি-আই-পি মানসিকতা সম্পন্ন সমাজে পরিবারের একজন পদাধিকারবলে 'ভি-আই-পি' হলে বৃহত্তর পরিবারের বাদবাকী সবাই ভি-আই-পি এমনকি ঘরের পরিচারিকাও!

গনতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায়ও এই আমলাতান্ত্রিক কৌলিন্যবাদী উপনিবেশিক প্রথার পরিবর্তন হয়নি- বরং নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাও স্থায়ী আমলাদের মতো ভি-আই-পি মানসিকতায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। উন্নত দেশে ভি-আই-পি প্রথা না থাকায় সাধারণের প্রবেশ বা অভ্যর্থনা রুমের সুযোগ-সুবিধা উত্তরোত্তর বেড়েছে আর আমাদের দেশে রাজা-প্রজা বা শাসক-শোষিতের আমলাতন্ত্র চালু থাকায় এ অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। ভি-আই-পি রুমে বিনা পয়সায় ফোন করার সুযোগ রয়েছে- সাধারণের কক্ষে পয়সা দিয়েও ফোন করার কোনো ব্যবস্থা নেই।

ভি-আই-পি মানসিকতা

বাংলাদেশের ভি-আই-পি প্রবেশ / প্রস্থান পথ হচ্ছে চোরাকারবারীর বা ড্রাগ ট্রাফিকিং এর অন্যতম প্রধান সদর দরজা। ঢাকার ধনীক এলাকা সমূহের দোকানগুলোতে যে সমস্ত দামী বিদেশী দ্রব্য পাওয়া যায় তার এক বিরাট অংশ আসে এই ভি-আই-পি পথে টেরিফ ফাঁকি দিয়ে। অনেকের ধারণা যে বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত অমূল্য ঐতিহাসিক ভাস্কর্য বিদেশে পাচার হয়ে গেছে তার অধিকাংশ পাচার হয়েছে এই ভি-আই-পি পথে।

ধনীক দেশ সমূহে যে সমস্ত 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' এর পুরো চামড়া পাওয়া যায় তার অনেকগুলো এসেছে ঢাকার ভি-আই-পি পথে। সুতরাং ভি-আই-পি রুম ভেঙ্গে দিয়ে একে সাধারণের অভ্যর্থনা কক্ষের সাথে যুক্ত করলে অনেক আমলার মাসিক আয়ের পরিমান কমে যাবে বৈকি! তবে উল্লেখ্য যে, জিয়া বিমান বন্দরের প্রবেশ পথের ইমিগ্রেশন ও ব্যাগেজ এলাকা আগের থেকে অনেক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন চেকিং ব্যবস্থা যে কোন উন্নত দেশের মতো কুইক তবে লাগেজ ক্যারলের ও কার্টের অবস্থা তথৈবচ-একাধিক ফ্লাইট একসাথে পৌছলে যাত্রীদের অবস্থা করুণ- হয়রানির শেষ নেই। তবে সুখের কথা যে, ইদানীং লাগেজ ক্যারল এলাকায় ফরেন একচেঞ্জ চোরাকারবারীদের প্রকাশ্যে ডলার - রিয়াল খরিদ করতে দেখা যায় না।

অলি-গলি জায়গা দখল, যানজট

গেল কয়েকবছর থেকে দেশে পর পর ধানচাল ও সব্জির বর্ধিত ফলন হওয়ায় এবং বন্যা-প্লাবন না হওয়ায় গ্রাম বাংলার সাধারণ নাগরিকের জীবনে দারিদ্র কিছুটা কমেছে। এখন আগের মতো গ্রাম বাংলার রাস্তার দ'ুধারে নেংটা ছেলেমেয়েদের ভিড় দেখা যায় না। বরং রিকশা ভর্তি সবজি, শার্টপেন্ট পরা ছেলেমেয়ে এবং সেন্ডেল পরা মুসল্লিদেরও দেখা যায়। বোরকা পরা মহিলাদের সংখ্যাও বেড়েছে। সেদিক থেকে দেশের উন্নয়ন হয়েছে বলে মনে হয়। তাছাড়া ঢাকার ধনীক বা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়িগুলোতে আসবাবপত্র বা ফার্ণিচারের উন্নয়নও হয়েছে - অনেক দামী জিনিসের হলাহল। ঝাকঝমকে বিয়েসাদীর সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। তবে মশার উপদ্রব,সন্ত্রাসের ভয়, চাকরির অভাব,যানজটের অবস্থা, রাস্তাঘাটের জোর-দখল, দূষনীয় পরিবেশ এবং বিশেষ করে 'সত্যিকার বিচার না পাওয়ার আশংকা' জনজীবনে নিয়ে এসেছে ভয়-ভীতি অনিশ্চয়তা আর হতাশা।

আজকের বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে প্রথমতঃ সন্ত্রাসের ভয় এবং দ্বিতীয়তঃ বিচার না পাওয়ার আশংকা। সন্ত্রাস সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে দু'টো বিষয়ে দৃষ্টিপাত প্রয়োজন বোধ করি। প্রথমতঃ হচ্ছে বেআইনীভাবে সরকারী রাস্তা দখল করে বড় বড় দালানকোঠা বা দেওয়াল তৈরী করার ফলে সারাটি শহর অলিগলিতে রূপ নিচ্ছে এবং

এরফলে যদি কোথাও আগুন ধরে বা ইমার্জেন্সী অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে দমকল বাহিনী বা এমবুলেন্সের অকুস্থলে পৌছার উপায় থাকবে না। দূর্নীতি পরায়ন কর্মচারীরা অল্প টাকার বিনিময়ে মানুষের জানমালের উপর যে দুঃখজনক অবস্থা ডেকে আনছেন তা থেকে তারা কি রেহাই পাবেন? আগুন লাগলে অথবা দৈহিক বা শারিরিক ইমারজেন্সির প্রয়োজন হলে রাস্তার ঐ দুই হাত জায়গা যা তারা ঘুষের বিনিময়ে বেদখল করতে আপত্তি করেননি -তা তাদের জীবনেও অভিশাপ নিয়ে আসতে পারে।

সন্ত্রাস, বিচার বিভাগ, চাকরির অভাব

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে তাদের রাস্তায় চলাকালে সাধারণ যানবাহন স্বল্প সময়ের জন্যে স্থগিত রাখা হয়। যেহেতু রাস্তাঘাট অল্প এবং যানজট প্রচুর সেজন্যে এতে জনগনের যথেষ্ট দূর্গতি হয়। অনেক দেশে যেমন যুক্তরাষ্ট্রে সে জন্যে রাষ্ট্রপতি যেখানে থাকেন সেখানেই তিনি অফিসও করেন। ওয়াসিংটনের‘হোয়াইট হাউসের’দোতলায় প্রেসিডেন্ট বসবাস করেন, একতলায় দপ্তর চালান। এরফলে আনাগোনাতে তার অতি মূল্যবান সময় নষ্ট হয় না এবং নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয় না।

আমেরিকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টরাও একইভাবে একই বিল্ডিংএ বসবাস করেন ও দপ্তর চালান। এতে তাদের অতি মূল্যবান সময় যাতায়াতে নষ্ট হয় না। বাংলাদেশের সরকার প্রধান যদি একই স্থানে বসবাস ও দপ্তর পরিচালনা করেন তাহলে নিরাপত্তা বাড়বে, যানজট কমবে এবং আনাগোনায় সময় নষ্ট হবে কম। বিষয়টি সরাকার প্রধান বিবেচনা করতে পারেন বৈ কি !

দেশের প্রধান সমস্যা হচ্ছে সন্ত্রাসের ভয়, বিচার না পাওয়ার আশংকা, চাকরির অভাব এবং দূর্নীতি। দূর্ভাগ্য যে, দেশের রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক কর্মসূচী এ বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষ কোনো উদ্যোগ গ্রহন করেনি- বিরোধী দলসমূহ বেআইনীভাবে সরকারের পতন ঘটাতে ধর্মঘট - হরতাল আহবান করে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার মতলবে ব্যস্ত। আর সরকারদল বিরোধীদল সমূহকে বা তাদের নেতাদের জেল-জুলুম দিয়ে হয়রানিতে রাখতে ব্যস্ত। উভয় দলের মূখ্য উদ্দেশ্য গদিতে যাওয়া-কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে নয়, ছল-চাতুরী বা সরকারকে অকেজো করে; মানুষের জীবনকে হাইজ্যাক করে। এমন অবস্থা সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক নয়।

ঢাকার পুলিশ আই-জির তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে প্রতিমাসে মাত্র ৬১টি গুরুতর অপরাধ ঘটে। কিন্তু দেশের পত্রিকা খুললেই রাহাজানি, ধর্ষণ, হত্যা, সন্ত্রাস লেগেই আছে দেখা যায়।

আই-জির দপ্তর জানালেন যে, অনেকেই অপরাধ ঘটলেও পুলিশের কাছে রিপোর্ট করে না এবং এজন্যে তাদের সংখ্যা অতি অল্প। তবে তার মতে 'সন্ত্রাস নয়, সন্ত্রাসের ভয়ই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ও ভয়ানক'। দেশে দুই ধরণের সন্ত্রাসী রয়েছে- প্রথমতঃ বেকার যুবক। এদের অনেকেই শক্তিশালী রাজনীতিবিদ বা সরকারী আমলার সহায়তা বা ছত্রছায়ায় থাকে। এরা বাড়ি বানাতে গেলে চাঁদা চায়, ব্যবসা করতে গেলে চাঁদা চায়, ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গেলে হাইজ্যাক করে নিয়ে যায়, টেন্ডার দিতে দেয় না, বাড়িতে এসে হানা দেয় এবং যখন-তখন নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে খুন-খারাবি করে। এদের কোনো দল নেই -তারা সব দলের। এদের কথা পত্র-পত্রিকায় যদিও সব সময় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হয়, কিন্তু এদেরকে পুলিশ ধরে না। এদেরকে কোর্টে নিলে পুলিশ রিপোর্টে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় কোর্ট তাদের ছেড়ে দেয়। এরা এক ধরণের সন্ত্রাসী এবং এদের মদদ জোগায় সরকারী আমলা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বিশেষ করে দূর্নীতিপরায়ন পুলিশ বাহিনী। যেহেতু এদের শাস্তির বিচার হয় না, শাস্তির বিচার নেই, সুতরাং এরা যথেচ্ছচারী হয়ে উঠে। এদের ভয়ে জনগন আতংকিত। তবে এদের থেকে বড় সন্ত্রাসী হচ্ছে দূর্নীতিপরায়ন আমলা। এই দূর্নীতিপরায়ন আমলারা আপনার জীবনকে নাভিশ্বাষ করে তুলে এবং তাদের ঘুষ দিতে অস্বীকার করলে তারা সন্ত্রাসীদের আপনার পেছনে লাগিয়ে দেয়।

বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দূর্নীতি পরায়ন দেশ

আজ বাংলাদেশ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী দূণীতিপরায়ন দেশ হিসেবে পরিচিত এবং বিশ্বব্যাংকের ভাষ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের গড় বার্ষিক জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার আরো অতিরিক্ত ২.৯% ভাগ বাড়তো যদি দূর্নীতি না থাকতো। * সম্প্রতি (২৮শে জুন-২০০১) বিশ্বের একটি নির্ভরশীল দূর্নীতি পর্যবেক্ষক সংস্থ **ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল** জানিয়েছে যে, বিশ্বের ৯১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে দূর্নীতি পরায়ন দেশ। তাছাড়া দারিদ্র ২৫%ভাগ কমতো এবং দেশের গড় মাথাপিছু আয় দুইগুন বাড়তো।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর জনপ্রতি কাষ্টম্স অফিসাররা ঘুষের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১,২৫,০০০ থেকে ২ **মিলিয়ন** টাকা এবং আয়কর অফিসাররা জনপ্রতি ৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় করেন। রাজস্ব বিভাগ ও চাটগাঁর পোর্ট ট্রাস প্রতিবছর অতিরিক্ত ৬ হাজার কোটি টাকা আত্মস্যাৎ করেন। প্রতিটি পাওয়ার কানেকশানের জন্যে প্রতিটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর ৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা, বাসা-বাড়ির কানেকশানের জন্যে ১০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হয়। এভাবে শুধুমাত্র পাওয়ার কানেকশানের বাবদ সরকারকে প্রতিবছর একহাজার কোটি টাকা গচ্ছা দিতে হচ্ছে।

প্রতিটি পদে পদে ঘুষ দিতে হয় বলে বাংলাদেশ **লেবার কস্ট** কম হওয়া সত্ত্বেও শিল্প স্থাপন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়- **ট্রানজেকশন কস্ট** অত্যধিক বেশী হওয়ায় দেশে শিল্পায়ন হচ্ছে না এবং এরফলে বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে।

সরকারের তথ্য অনুযায়ী হাসিনা সরকারের বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রচারণা সফল হওয়ার ফলে স্বদেশে ৯.৬ বিলিয়ন ডলারের 'বৈদেশিক বিনিয়োগ' নিবন্ধিত হয়েছে। তবে কার্যপদ্ধতি, বিনিয়োগ পরিবেশ ও দূর্নীতি প্রবল হওয়ায় এই নিবন্ধনকৃত বিনিয়োগের মাত্র ৮.৩% ভাগ বাস্তবে বিনিয়োগ হয়েছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এর পরিমান বড়ই কম- অন্যান্য দেশে নিবন্ধনকৃত বিনিয়োগের ৭০% থেকে ১০০% ভাগ বাস্তবে বিনিয়োগ হয়। এই বিনিয়োগ না হওয়ার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ, ধর্মঘট, লালফিতার দৌরাত্ম ও আইন শৃংখলার হতাশাব্যাঞ্জক অবস্থা। এসব বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রধান মস্তান, চাঁদাবাজ এবং সন্ত্রাসীরা হচ্ছে দূর্নীতিপরায়ন আমলাগোষ্ঠী যাদের কারণে দেশের শিল্পায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে এবং বেকার সমস্যা বাড়ছে, সন্ত্রাস বাড়ছে।

গেল বছর জেদ্দার রাজকীয় অতিথি ভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টি দূর্নীতি দমনের প্রতি আহবান করলে বন্ধুবর তৎকালীন চীফ প্রোটোকল অফিসার রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন আহমেদ (বর্তমানে ইতালীর রাষ্ট্রদূত) ও তৎকালীন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আব্দুল মোমেন চৌধূরী বাঁধা প্রধান করে জানালেন যে, কেনিয়া ও নাইজেরিয়ায় অধিকতর দুর্নীতি রয়েছে এবং এরফলে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া সহজ, তবে এটা দেশের কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং সন্ত্রাসের ভয় দিন দিন বাড়ছে। এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে বিশ্বব্যাংকের বহুজাতিক অনুদান ও ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন বিঘ্ন সৃষ্টি হবে তেমনি স্বদেশের উন্নয়নও বিঘ্নিত হবে।

এই দুর্নীতি পরায়ন আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে মুক্তির অন্যতম পথ হচ্ছে জেলায় জেলায় নির্বাচিত জেলা সরকার ব্যবস্থার সৃষ্টি যারা সম্পদের বিলিবন্টন, কর্মচারীর নিয়োগ ও বরখাস্ত, বেতন ও অন্যবিধ ভাতা, স্থানীয় আইন শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সবকিছুর দায়িত্বে থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সীমিতকরণ ও ডেপুটি সেক্রেটারীর উর্ধ্বের সকল সরকারী পদবী পাবলিক শোনানীর মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য লোকের নিয়োগ প্রদান। অর্থাৎ প্রশাসনিক ও শাসনতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক কাঠামো সৃষ্টি করা অবশ্য প্রয়োজন। না হলে দেশের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, সন্ত্রাস, বিচার না পাওয়ার আশংকা এবং যথেচ্ছাচারিতা দিন দিন বাড়তেই থাকবে।

রিয়াদ, জানুয়ারী ২০০১

বাংলা নব বর্ষ ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশে এক ধরণের গোঁড়া ধর্মাবলম্বী মুসলমান রয়েছেন, যারা ১লা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ পালনকে অধর্ম এবং ইসলামের পরিপন্থী মনে করেন। বৈশাখ শব্দের সাথে তারা হিন্দুয়ানী গন্ধ পেয়ে থাকেন এবং *বঙ্গাব্দ* বা বাংলা ক্যালেন্ডার তারা কোনো ক্রমেই গ্রহণ করতে রাজি নন। এদের ধারণা বিশ্বকর্তা মুসলমানদের হিজরী মাস যেমন মোহররম, রমজান, রবিউল আউয়াল, রবিউস্‌সানি ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন না। বিশ্বকর্তার বিশালতা ও গভীরতা সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই স্থুলজ্ঞান থাকায় এ ধরণের উচ্ছ্বাস ও আবেগ অনেকের মধ্যে দৃষ্ট হয়। বিশ্বকর্তা যেমন বিভিন্ন ধরণের ও জাতের মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন একিভাবে বিভিন্ন রকমের ভাষা ও ক্যালেন্ডার মানবজাতিকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর রঙের ও বৈচিত্রের খেলা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে তিনি সব ভাষার মালিক, সব ক্যালেন্ডারের স্রষ্টা-সবকিছুই তিনি জানেন ও বুঝেন। সবই তার। সুতরাং বৈশাখ হিন্দুয়ানী আর হিজরী মুসলমানী- এ ধরণের বিতর্ক নিরর্থক। এ গুলোর দাবীদার হয়ে ঝগড়া-বিবাদ ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ অবান্তর। মহান আল্লাহপাক চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র তৈরী করে দিয়েছেন সময় তারিখ গণনার জন্যে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ক্যালেন্ডার তৈরী করার জ্ঞানবুদ্ধি ও ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন। তা দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধরণের ক্যালেন্ডার তৈরী করেছে নিজেদের প্রয়োজনে। ভারতবর্ষে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্ঠান-জৈন ও মুসলমানদের বিভিন্ন পূজা-পার্বন বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির সন-তারিখ নির্ণয়ের জন্যে প্রায় ৩০টি বিভিন্ন ধরণের ক্যালেন্ডার রয়েছে। এ গুলোর অনেকগুলোই চন্দ্রভিত্তিক। আবার অনেকগুলো সূর্য ভিত্তিক।

আরবী মাস চন্দ্র ভিত্তিক, তবে ইংরাজি মাস সূর্য ভিত্তিক এবং এ জন্যে এদের মধ্যে বছরে প্রায় ১১ দিনের তফাৎ লক্ষিত হয়। চন্দ্র-বছর **(লুনার ইয়ার)** ৩৫৪ দিন, ৮ ঘন্টা, ৫৩ সেকেন্ডে হয়। তবে সূর্য-বছর **(সোলার ইয়ার)** হতে ৩৬৫দিন, ৫ ঘন্টা, ৪৮ মিনিট ও ৪৬ সেকেন্ডের দরকার হয়।

সম্রাট আকবর সহজে খাজনা আদায়ের জন্যে বাংলা ক্যালেন্ডার বা তারিখ-ই-ইলাহী (আল্লাহর ক্যালেন্ডার) চালু করেন ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে বা (৯৯২ হিজরি)তে। দ্বীন-ই-ইলাহীর মতো এও ছিলো এক সকল ধর্মের সম্মিলন। ঐ সময়ে সম্রাটের খাজনা আদায় হতো শস্য প্রদানের মাধ্যমে। শস্য ফলনের পর পরই খাজনা আদায় হলে সাধারণ কৃষককূল সরকারের উপরে অসন্তোষ হবে না এ জন্যে যে, তখন অভাবের টান নেই এবং তাতে

প্রথমতঃ সহজে খাজনা আদায় হবে এবং দ্বিতীয়তঃ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও কম হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলার মানুষ সব সময়ই খুব স্বাধীনচেতা হওয়ায় সময় সময় তারা দিল্লীর সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করতো- এ অবস্থা এড়ানোর জন্যে সম্রাট আকবর তার দরবারের বিশিষ্ট জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ আমির ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজীকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন এমন একটি সন-তারিখ নির্ণয় করে দেন যাতে নবান্ন আদায় সম্ভব হয় এবং ভারতীয় ঐতিহ্য বহাল থাকে। তার উপদেশে সম্রাট আকবর ১৫৮৪ সালে বাংলা নববর্ষ চালু করেন। তবে আরবি হিজরি ক্যালেন্ডার অনুসারণ করে ৯৬২ বঙ্গাব্দকে বা ৬২২ খৃষ্টাব্দকে প্রথম বর্ষ হিসেবে ধরা হয়। হিজরি ক্যালেন্ডার চালু হয় দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের (রাঃ) সময় ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে। মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই বা ১২ই রবিউল আওয়ালে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন এবং তার ১৬ বছর পর ১২ই রবিউল আওয়ালের পরিবর্তে হিজরি সন শুরু হয় ১লা মোহররমে এবং ৬৩৮ সনের পরিবর্তে ৬২২ খৃষ্টাব্দ থেকে। তাছাড়া বাংলা সন ও তারিখ শব্দ সমূহ আসে আরবি *সানা* (বছর) ও *তারিখ* (দিন বা দিক) থেকে। যেহেতু বাংলা নববর্ষ ফসল আদায়ের জন্যে ব্যবহৃত হতো, সে জন্যে একে ফসলী সন ও বলা হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা সন ও আরবি হিজরি সন এ দুটোই মহানবীর হিজরতের ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করে তৈরী হয়। তবে প্রশ্ন হতে পারে তাহলে বর্তমানে হিজরি সন হচ্ছে ১৪২৩ আর বাংলা সন হচ্ছে ১৪০৯- এ কেমন করে !?

আগেই বলেছি বাংলা সন মূলতঃ সূর্য ভিত্তিক এবং আরবি সন হচ্ছে চন্দ্র ভিত্তিক। যেহেতু বছরে ১১ দিনের ব্যবধান হয় চন্দ্র ও সূর্য ভিত্তিক হিসাব-নিকাসে। সেজন্যে বাংলা সন ও হিজরি ক্যালেন্ডারের মধ্যে গেল এত বছরে সর্বমোট ব্যবধান হয়েছে ১৪ বছরের। যদিও উভয়ের গণনা শুরুর দিন ধার্য করা হয় একই বছরকে কেন্দ্র করে।

সম্রাট আকবর ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্যে অনুরূপভাবে বিভিন্ন ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনেক ভৌগলিক এলাকার জনগন সেই সব সন তারিখ বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় কিংবা গ্রেগোরিয়ান (ইংরেজি) সন তারিখ গ্রহণ করেন। তবে উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় বা সামাজিক বিষয়াদিতে এখনো জনগন চন্দ্র ভিত্তিক সন তারিখ ব্যবহার করেন এবং প্রশাসনিক কাজে তার গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার সূর্য ভিত্তিক ক্যালেন্ডার ব্যবহার করছেন।

যেহেতু সম্রাট আকবর হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্খা, দাবী-দাওয়া ইত্যাদির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং জ্যোতির্বিদ সিরাজী ভারতীয় তিথি (চন্দ্র দিন)

রাশী (জডাইয়িক অবস্থান) ইত্যাদি বিষয়ে সুপন্ডিত ছিলেন এবং হাজার বছরের পুরানো ভারতীয় শাকা ক্যালেন্ডারের সাথে পরিচিত ছিলেন, সেজন্যে মাসগুলো স্থানীয় মাসগুলোর হিসাবে গ্রহন করেন। ভারতীয় ধর্মীয় ক্যালেন্ডারে সূর্য-চন্দ্রের অবস্থান ও দিনক্ষণ নিম্নরূপ।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে নববর্ষ হচ্ছে ১৪ই এপ্রিল, শ্রীলংকায় ১৩ই এপ্রিল এবং নেপালে ১২ই এপ্রিল- এমন সাদৃশ্য প্রমান করে যে, যদিও আরবি হিজরির প্রেক্ষিতে বাংলা নববর্ষ শুরুর তারিখ নির্ণয় হয়, তবে মাস দিনের সময় নির্ণয় হয় ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের হিসাব-নিকাশ ভিত্তিক।

ভারতীয় ধর্মীয় ক্যালেন্ডার ও সূর্যের অবস্থান

বাংলা তারিখ	সূর্যের অবস্থান	দিনের সময়	গ্রেগোরিয়ান তাঃ
১লা বৈশাখ	২৩. ১৫ ডিগ্রি	৩০.৯	এপ্রিল ১৩
১ জ্যৈষ্ঠ	৫৩. ১৫	৩১.৩	মে ১৪
১ আষাঢ়	৮৩. ১৫	৩১.৫	জুন ১৪
১ শ্রাবণ	১১৩. ১৫	৩১.৪	জুলাই ১৬
১ ভাদ্র	১৪৩. ১৫	৩১.০	আগষ্ট ১৬
১ আশ্বিন	১৭৩. ১৫	৩০.৫	সেপ্টেম্বর ১৬
১ কার্ত্তিক	২০৩. ১৫	৩০.০	অক্টোবর ১৭
১ অগ্রহায়ণ	২৩৩. ১৫	২৯.৬	নভেম্বর ১৬
১ পৌষ	২৬৩. ১৫	২৯.৪	ডিসেম্বর ১৫
১ মাঘ	২৯৩. ১৫	২৯.৫	জানুয়ারী ১৪
১ ফাল্গুন	৩২৩. ১৫	২৯.৯	ফেব্রুয়ারী ১২
১ চৈত্র	৩৫৩. ১৫	৩০.৩	মার্চ ১৪

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা ক্যালেন্ডার প্রথম পাঁচটি মাস- বৈশাখ থেকে ভাদ্র-৩১ দিনে হয় এবং বাকী সাতটি মাস টু আশ্বিন থেকে চৈত্র- ৩০ দিনে। তবে প্রতি চার বছর অন্তর যখন বছর ৩৬৬ দিনে হয় (সৌর জগতের কারনে) তখন ৩০ দিনের ফাল্গুন মাস ৩১ দিনে রূপ নেয়। গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারে প্রতি ৪ বছর অন্তর ২৮শে ফেব্রুয়ারিতে ১ দিন অতিরিক্ত যোগ হয়- ফাল্গুন মাস ফেব্রুয়ারিতে অবস্থিত হওয়ায় ফাল্গুনে ১ দিন যোগ দেয়া হয়।

বাংলা বঙ্গাব্দ ১৫৫৬ খৃঃ বা ৯৬৩ হিজরি থেকে গননা করা হয়। কারণ ঐ সালে সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহন করেন। পাক-ভারতে রাজা -বাদশার সিংহাসন আরোহন ভিত্তিক ক্যালেন্ডার আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। যেমন-লক্ষ্মনাব্দ, বিক্রমাব্দ, (জালালী সন, সিকান্দর শাহ সন) শকাব্দ, গুপ্তাব্দ ইত্যাদি। এখানে লক্ষণীয় যে, সম্রাট আকবর আকবরাব্দ না বলে বঙ্গাব্দ চালু করেন। বঙ্গাব্দ শব্দটি সারা বঙ্গের প্রতীক বলে আকবর প্রবর্তিত বাংলা ক্যালেন্ডার বিলীন হয়ে যায়নি।

বরং বাংলার জনগন একে নিজেদের ক্যালেন্ডার হিসাবে গ্রহণ করে একে আপন মহিমায় সাজিয়ে রেখেছে- প্রতি বছরে নববর্ষ নতুন আশা ও প্রেরণা নিয়ে বাংলার দ্বারে উপস্থিত হলে জনগন তাকে আপন ভূবনে সাদরে গ্রহণ করে। কবির ভাষায় - *এসো হে বৈশাখ, এসো....এসো......*

হোয়াইটীকার এলমানাক্ বর্ণিত- **(Whitaker Almanac)** ভারতবর্ষের ৭টি প্রধান প্রধান ক্যালেন্ডার........

ইংরেজি ২০০০ সালে ওগুলোতে বর্ষ পর্ব কত তা লিপিবদ্ধ হলো

*কালি ইউগা ক্যালেন্ডার-		৬০০১ সাল
*বৌদ্ধ নিরবানা	,,	২৫৪৪ ,,
*বিক্রম সমভাত	,,	২০৫৭ ,,
*সাকা	,,	১৯২২ ,,
*ভিদান্ত জয়তীশা	,,	১৯২১ ,,
*বাংলা নববর্ষ বা তারিখ-ই-ইলাহি		১৪০৭ ,,
*কল্লাম	,,	১১৭৬ ,,

৮ই বৈশাখ ১৪০৯ বাঙলা
২১ এপ্রিল-২০০২ইং
রিয়াদ, সউদী আরব।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিত

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তর তর হে....
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে...।

আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪১তম জন্মজয়ন্তীতে উপরের গানটি বার বার উথলি উঠছে। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনে অন্তর বিকশিত করার, নির্মল করার এবং সুন্দর করার ডাক এসেছে। আজ সারা দেশে হিংসা, প্রতিহিংসা ও সন্ত্রাসের এক মন-মানসিকতা যেভাবে সর্বস্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সে থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে হৃদয়ের পরিস্ফুটন। তাহলেই এ পংকিল পথ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

আজকের বাংলা দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগীতা ও সম্মানবোধ নেই বললেই চলে। প্রাক্তন মন্ত্রী বা জননেতাদের লাঠিপেটা করে নির্যাতন এবং জেলের অভ্যন্তরে বিনা বিচারে আটকাবস্থায় অমানবিক আচরণ করে দম্ভ প্রকাশ নিকৃষ্ট মনেরই পরিচায়ক বৈকি! এ ধরনের অত্যাচার বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের ১১নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থীই শুধু নয়, এটা জাতির জন্যে কলংককর, লজ্জাজনক। এ অবস্থা চলতে থাকলে জাতি পিছিয়ে যেতে বাধ্য। যারা এখন শক্তিধর তাদের জানা আছে...

হে মোর দূর্ভাগা দেশ
যাদের করেছো অপমান
অপমান নিতে হবে তাদের সবার সমান
অথবা-
যারে তুমি নীচে দেখ
সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছো যারে
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে

আজ বর্হিবিশ্বের বিভিন্ন দেশ অজয়কে জয় করার পথে। সেই একি সময়ে রবিঠাকুরের ভাষায় আমরা এখনো উঠোনের মাচার উপরকার লাউকুমড়ার মোকদ্দমা নিয়েই ব্যস্ত। এ অবস্থা থেকে অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে।

এজন্যে সকল দলের, সকল মতের আজ প্রয়োজন দ্বার রুদ্ধ করিওনা, প্রবেশের দ্বার দিয়া প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া প্রস্থান করিবে- যেখানে দ্বার রুদ্ধ সেখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।
সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্তি তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত্ত নিস্পন্দিত করো হে।
নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে।

বাংলাদেশে গেল নির্বাচনোত্তর সংখ্যা লঘুদের উপর অমানবিক নির্যাতন এবং গেল কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারতের গুজরাটে মুসলমানদের উপর নিধনযজ্ঞ প্রমান করে যে, মানুষের মাঝে অশুভ শক্তি এখনো প্রবল। সকল মানুষ এক আদমের সন্তান একথা কীভাবে আমরা বার বার বিস্মৃত হই? এই ভারতবর্ষে -

হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়-চীন-
শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে লীন

তারপরও কীভাবে আজো আমরা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানবহত্যায় মহাব্যস্ত? বরং আমাদের আহবান হওয়া উচিত...

এসো হে আর্য, এসো হে অনার্য, হিন্দু-মুসলমান
এসো এসো আজি তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাক্ষ্মন, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।

গেল কয়েকমাসে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে শিশু-কিশোর, বালিকা-গৃহবধু-বৃদ্ধা- এরা যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে, ধর্ষিত হয়েছে তা দেখে নীরবে নিভৃতে কাঁদতে হয়।

শোনো শোনো আমাদের ব্যথা দেব-দেবী প্রভু দয়াময়,
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাঁটিছে হৃদয়।
চিরদিন আঁধার না রয়, রবি উঠে, নিশি দূর হয়,
এ দেশের মাথার উপরে এ নিশিথ হবে নাকি ক্ষয়।

চিরদিন ঝরিবে নয়ন? চিরদিন ফাঁটিবে হৃদয়?
মরমে লুকাবো কত মুখ, ঢাকিয়া রাখিছি ম্লানমুখ
কাঁদিবার নাই অবসর-কথা নাই, শুধু ফাঁটে বুক!
সঙ্কোচে ম্রিয়মান প্রাণ, দশদিশি বিভীষিকাময়!
হেনহীন দীনহীন দেশে বুঝি তব হবে না আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে হৃদয়।
কোনো কালে তুলিব কি মাথা, জাগিবে কি অচেতন প্রাণ?
বলো প্রভু, মুছিবে এ আঁখি, চিরদিন ফাটিবে না হিয়া

আজ বাংলাদেশ একটার পর একটা দূর্ণামে জর্জরিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অন্যকে দোষারোপ দেয়ার পূর্বে আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রথমতঃ সংখ্যালঘু নির্যাতন, দ্বিতীয়তঃ মাহিমা-সাবিনা-সাবরিমা প্রমুখের ধর্ষণ তৃতীয়তঃ অনিয়মের কারণে ফিফার বিশ্বকাপ থেকে বহিস্কার, চতুর্থতঃ ফার ইষ্টার্ন পত্রিকায় তালেবান প্রতিবেদন, পঞ্চমতঃ বিদেশী সরকার দূর্ণীতির অভিযোগ তুলে প্রকাশ্যে বক্তব্য পেশ, ৬ষ্ঠঃ কৃতি সাতারুকে পুলিশের কাষ্টডি থেকে বের করে এনে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা, সপ্তমতঃ পরপর পাল্টাপাল্টি দূর্ণীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ, অষ্টমতঃ সরকারের সাথে সংশ্লিষ্টদের দূর্ণীতি মামলা থেকে বিনাবিচারে বেকসুর খালাস, নবমতঃ ফুটবল খেলার নামে আদম পাচার, দশমঃ বিভিন্ন মন্ত্রী- মিনিষ্টার প্রমুখের মিথ্যার যথেচ্ছারিতা, তাছাড়া রয়েছে পর পর একাধিক লোকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা ও কারাগারের ভিতরে অমানবিক অত্যাচার, সম্পত্তি লুট, জমি দখল, অফিস দখল, হাট-বাজার দখল, স্কুল দখল, বাস ষ্টেশন, লঞ্চ ঘাট, রেলপথ দখল এবং অপ্রতিরোদ্ধ সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী ও মানুষ হত্যা- এ সমস্ত ঘটনা দেশের ভাবমুর্তিকে যেমন খন্ডিত করেছে একিভাবে জাতির জন্যে বয়ে নিয়ে এসেছে বিপদ, লজ্জ্বা ও অপমান।

তাই কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি-

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয় বরং
বিপদকে যেন করিতে পারি জয় এবং আমি জানি
মেঘ দেখে তুই করিস নারে ভয়, আঁড়ালে তার সূর্য হাসে ।

দেশের এই ক্রমঅধঃগতিও দূর্যোগয়ময় অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে সবাই মিলে প্রার্থনা করি-

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল-
পূণ্য হউক, পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির সব, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ।

২৫শে বৈশাখ ১৪০৯বাঙলা
৮ই মে, ২০০২, রিয়াদ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বোস্টনের ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা তথা মুক্তি সংগ্রামে বোস্টন প্রবাসী বাংলাদেশীগন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরুতে ঢাকা থেকে ফিরে আসা সেখানকার কলেরা রিসার্চ সেন্টারের কতিপয় গবেষকের উদ্যোগে বাংলাদেশ পরিচিতি ও সেখানে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অত্যাচার বিশ্বের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে ছিলেন ড. উইলিয়াম গ্রীনো, ড. চেস, ড. ও মিসেস জন টেলর, ড. এল মার্টিন, ড. ডেভিড নলীন, ড. চেন। পরবর্তীকালে এঁরা Disaster in Bangladesh_নামে একটি বইও প্রকাশ করেন। এঁরা বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন থেকে শুরু করে বাল্টিমোর বন্দরে পাকিস্তানী জাহাজ থেকে নেমে পড়া বাংলাদেশী নাবিক ও অফিসারদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতেন। এই গবেষকদের অনেকেই বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসে বাল্টিমোরের জনস পকিন্স এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ নেন।

বোস্টনের শেখ আব্দুল ওহ্হাবের সাথে এদের পরিচয় ঢাকার কলেরা রিচার্স সেন্টারে। জাহাজ থেকে নেমে পড়াদের মধ্যে যারা বাংলা জানতেন না তাঁদের সাথে কথা বলার জন্যে ওহ্হাব সাহেবের মাঝে মাঝে ডাক পড়তো বলে তিনি জানালেন। বেগম সালমা খায়েরের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সমুদ্র বন্দরে কবে কখন কোন জাহাজ পাকিস্তানের জন্যে অস্ত্র বোঝাই হবে তার খবর সংগ্রহ ও প্রচার, কিভাবে তা প্রতিহত করতে হবে সেসব প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য কাজ করতেন।

বোস্টনে তখন মাত্র দশ বারোটি বাংলাদেশী পরিবার। তাঁদের মধ্যে খোরশেদ আলম (রাষ্ট্রদূত), আমিনুল ইসলামও আমিরুল ইসলাম (দুজনই প্রকৌশলী), মরহুম ড. মাহবুবুল আলম, ড. ফজলে করিম, মুবিনুল ইসলাম চৌধুরী, মিঃ দোহা, ড. মহিউদ্দিন আলমগীর, নিশাত খান, রেজা রহমান, কাজী রেজাউল হাসান, তাইয়েব উদ্দিন মাহতাব, কাজী শাহজাহান বেলাল, শেখ আব্দুল ওহ্হাব, হায়াত ইমাম, ড. সাজেদ কামাল,

ড. বিনয় পাল, খায়রুল আসাব, জহীরুল হক প্রমুখ পরিবার ছিলেন। বাংলাদেশে যখন গণআন্দোলন চলছে বিশেষত পাকিস্তানের সামরিক শাসন ইয়াহিয়া খান যখন পয়লা মার্চ ঘোষণা করলো যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে না। তখন মাহবুবুল আলমের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ৫ই মার্চ বাংলদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যাণ্ড গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি তিনটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১. আমেরিকান জনগনের কাছে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের চিত্র ও বাংলাদেশকে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে তুলে ধরে তাদের সক্রিয় সাহায্য সমর্থন আদায় করা।

২. সিনেটের কংগ্রেসম্যানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে প্রভাবিত করা।

৩. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সাধ্যমত আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রেরণ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরিচিত করে তোলার লক্ষে ১৯৭১ সালের ৬ই মার্চ নিউ ইংল্যাণ্ড বাংলাদেশ সমিতি বোষ্টনে বাংলাদেশ বাটন্ বিতরণ করে। এই বাটন্ বা বোতামে বাংলাদেশের তৎকালীন পতাকা খচিত ছিলো। সমিতির প্রায় সভাগুলো হার্ভাডের পপুলেশন সেন্টার বা ডক্টর আলমের বাসায় অনুষ্ঠিত হতো।

২৫শে মার্চের সেই কালো রাত্রির পরিপ্রেক্ষিতে ড. মহিউদ্দিন আলমগীর ২৬শে মার্চ সি,বি,এস এর স্থানীয় সংবাদে বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞের ওপর বক্তব্য রাখেন। একই দিন বাংলাদেশ সমিতির পক্ষ থেকে বাংলাদেশে গনহত্যা বন্ধের জন্যে আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগের লক্ষ্যে একটি বিশেষ আবেদন পত্র প্রকাশ করা হয়। এই আবেদনে তিনজন স্বাক্ষর করেন। তাঁরা হচ্ছেন- ড. মহিউদ্দিন আলমগীর, তাইয়েব উদ্দিন মাহতাব এবং ড. টমাস উইসকপ। উইসকপ হার্ভার্ডের অধ্যাপক ছিলেন। মাহতাব উদ্দিন তখন টাফট্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছিলেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের লোক। এই আবেদনে ড. মাহবুবুল আলমের অর্থ সাহায্য প্রেরণের অনুরোধ জানানো হয়।

মিসেস সৃজান আলমগীর এবং ড. মহিউদ্দিন আলমগীরের সহায়তায় হার্ভার্ডের তিনজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ডীন এডোয়ার্ড ম্যাসন, রবার্ট ডর্ফম্যান ও স্টীফেন মার্গলীন- ১৯৭১ সালের পয়লা এপ্রিল একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

এতে তাঁরা বলেন- **The emergence of independent Bangladesh is inevitable.** একটি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। এ প্রবন্ধটির কথা তখন থেকে বিভিন্ন সভায় উদ্ধৃত করা হতো। এপ্রিলের ১২ তারিখে বোস্টনে টেগোর সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমিতির উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন ডক্টর বিনয় পাল। বাংলাদেশ সমিতি ও টেগোর সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে তখন বোস্টনে **An evening of Bangladesh Music and Dance** অনুষ্ঠিত হয়। এতে ড. পাল এবং মিসেস পাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা নিউইর্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত পণ্ডিত রবি শংকর ও জর্জ হ্যারিসনের বাংলাদেশ কনসার্ট এ ও যোগ দেন। এই কনসার্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচিতি লাভ করে।

বাংলাদেশ সমিতির পক্ষ থেকে স্থানীয় বাংলাদেশীরা মাঝে মাঝে ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনের সামনে বিক্ষোভে অংশ নিতেন। ড. মাহবুবুল আলম আমেরিকা ও কানাডায় বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন তাঁর স্ত্রী সালমা বলেনঃ ওতো সারারাত ফোন করে চলতো আর বাংলাদেশের খবর যেখানে যেখানে যা বেরিয়েছে, তা সংগ্রহ করে রাখতো।
ড. আলম স্থানীয় সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডি ও এডোয়ার্ড ব্রোকের কাছে প্রত্রালাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভয়াবহ পরিস্থিতি তুলে ধরেন সিনেটর স্যাম্পবি, চেজ, মণ্ডেল প্রমুখের সাথে একযোগে। এই দুই সিনেটর পাকিস্তানে মার্কিন সমরাস্ত্র সরবরাহ বন্ধের প্রস্তাব স্বাক্ষর করেন। সিনেটর কেনেডি সিনেট ত্রান কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ভারতে বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন করেন।

ড. আলম ছিলেন তহবিল রক্ষার দায়িত্বে। তাঁর কাছে বোস্টনের বাঙালি ও স্থানীয় আমেরিকানরা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলাদেশীরা অর্থ সংগ্রহ করে পাঠাতেন। তিনি ১৯৮৪ সালে পরলোকগমন করেন। ড. আলম অত্যন্ত অমায়িক ও উদার হৃদয়ের ব্যক্তি ছিলেন।

সে সময়কার ফাইলপত্র থেকে জানা যায়, মিড-ওয়েষ্ট বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ইণ্ডিয়ানরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা গবেষক ড. এফ বি মালিক ড. আলমের কাছে ১৪৫০ ডলার পাঠিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। বোস্টনের চিকিৎসক ডাঃ রেজাউর রহমান সমিতির বাংলাদেশ তহবিলে একক ভাবে ৫৭২২ডলার দান করেন। এটাই ছিলো তাঁর পুরো সঞ্চয়। নিজের দৈনন্দিন খরচের জন্যে কিছু অর্থ রাখার জন্যে তাঁকে পরামর্শ দেয়া সত্ত্বেও তিনি সবটাই দিয়ে দেন।

এ ছাড়া বোস্টনের বাংলাদেশ সমিতির অন্যান্য সদস্যরা ৪৭৮৫ ডলার দান করেন। শিকাগোর বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগের সভাপতি প্রখ্যাত স্থপতি (বর্তমানে পরলোগত) ড. ফজলুর রহমান খান ঐ এলাকা থেকে ২,৭০০ ডলার এবং কানাডায় মানিটোবা বাংলাদেশ সমিতির সভাপতি ড. ফরিদ শরিফ সেখান থেকে ২,০০০ ডলার সংগ্রহ করে পাঠান। এই সর্বমোট ১৮,০০০ ডলার দিয়ে মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের জন্যে ইলেকট্রনিকস্ যন্ত্রপাতি পাঠানো হয়। এছাড়া বোস্টনের বাংলাদেশীরা তাঁদের সাপ্তাহিক আয়ের শতকরা ১০ ভাগ বাংলাদেশ তহবিলে দিতেন। বোস্টন এলাকার কিছু আমেরিকানের নামও অর্থ প্রদানকারীদের তালিকায় দেখা যায়। এঁদের মধ্যে মাইকেল ব্রোনো, পিটার মসলন, এজি গিনোয়োকো, টি ই উইসকপ, জে, রেডিচাল, জে, এস নাইস, এস হার্শম্যান প্রমুখগন উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য এলাকা থেকে ব্যক্তিগতভাবে ড. আলমের কাছে যাঁরা অর্থ পাঠিয়েছিলেন তাঁদের তালিকায় দেখা যাচ্ছে কানেকটিকাটের ড. কাজী আজিজুল হক ও ড. মনিরুল ইসলাম, ওহাইও র এ আর থানাদার, মিসিগানের জাকির হোসেন, ডাঃ শামসুল হক ও আনোয়ারুল হক, ওয়াশিংটনের এ এম এ মহীত, কানাডার জে আলম, ইন্ডিয়ানার মীর মেসন আলী। এছাড়া বিভিন্ন এলাকা থেকে যাঁরা যোগাযোগ রেখেছেন তাঁদের মধ্যে ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভারসিটির মি. ললিত, মিসিগানের মি. মণ্ডল, মি. আনোয়ার, ডাঃ বদরুদ্দোজা, এ রশীদ হাওলাদার ডেট্রয়েটের জহুর হোসেন, কুইবেক বাংলাদেশ সমিতির সাধারণ সম্পাদক নায়িম চৌধুরী, এইচ জাফর উল্লাহ্, নিউইয়র্কের ইষ্ট পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকা র সাধারণ সম্পাদক ফয়জুর রহমান ও মুজিব নগরের মেজর জব্বার (ওরফে হোসেন আলী) এর নাম দেখা যায়। এঁরা সময় সময় বিভিন্ন ধরণের চিঠিপত্রও লিখেছেন।

বাংলাদেশের পরলোকগত সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সায়িদ চৌধুরীর ভাষ্য অনুযায়ী বোস্টনের ড. মাহবুবুল আলম ও বৃহত্তর বোস্টনের বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের চেয়ারম্যান খোরশেদ আলম, ডঃ মহিউদ্দিন আলমগীর, তৈয়বউদ্দিন মাহতাব, রেজাউল হাসান তাঁর সাথে নিউইয়র্কে মে মাসে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি তাঁদেরকে মুজিবনগরে ইলেকট্রনিকস্ যন্ত্রপাতি পাঠাতে অনুরোধ জানান। বোস্টনের বাংলাদেশ সমিতির উদ্যোগে ৯৫টি ওয়াকি-টকি, ৩৫০৪টি রিচার্জেবল ব্যাটারী, ১০টি লং রেঞ্জ কম্যিুনিকেশন সেট, তিনটি ট্রান্সফরমার ইত্যাদি সরঞ্জাম পাঠানো হয়। বিচারপতি আবু সায়িদ চৌধুরীর ভাষ্য অনুযায়ী এ সবের তৎকালীন মূল্য ছিল ৮২ হাজার ৯শত ৫০ ডলার। এর মধ্যে ১৮৩১৪ ডলার বোস্টনের বাংলাদেশ সমিতি কর্তৃক সংগৃহীত হয়।

বাদবাকী আসে প্রেসিডেন্ট একাডেমির প্রধান নিউহ্যাম্পয়ারের ফ্রাঙ্কলীন পিটার্স ল সেন্টার- এর প্রেসিডেন্ট ও এমআইটি র প্রাক্তন অধ্যাপক ড. রবার্ট রাইমের সহায়তায়। যন্ত্রপাতিগুলো সংগ্রহে সাহায্য করেন এমআইটি র ছাত্র রেজাউল হাসান।

তখনকার আইনে বিদেশীদের এজাতীয় ইলেকট্রনিকস্ সরঞ্জাম ক্রয়ের উপর কড়াকড়ি ছিল। এ কারনে ড. রাইম নিজেই এ বিষয়ে সকল দায়িত্ব নেন। যন্ত্রপাতিগুলোর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা হাতে কলমে শিখিয়ে দেয়ার জন্যে বোস্টনের তৈয়ব উদ্দিন মাহতাব সমিতির পক্ষ থেকে মুজিবনগরে গমন করেন। এসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকের জ্ঞান সীমিত থাকায় এবং তখন সমিতির সাথে ঘনিষ্টভাবে যোগাযোগ না রাখার ফলে তারা কবি সুফিয়া কামালকে ভুল তথ্য প্রদান করেন এবং এই ভুল তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সুফিয়া কামাল ১৯৮০ সালের ঈদ সংখ্যা সন্ধানীতে লিখেন...... এখানে (বোস্টনে) এসে তো শুনলাম......... বাঙালির সেই চরম দুর্ভাগ্যের দিনেও এরা (বোষ্টনবাসী বাঙালি) তেমন সাড়া দেয়নি, দিয়েছে কি?

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবু সায়িদ চৌধুরী এসব যন্ত্রপাতির উপযোগীতা সম্পর্কে লিখেনঃ এইচ এফ কম্যুনিকেশন সেট পাঠানো হয় ১০টি। এগুলোতে দশ হাজার মাইল দূরেও কথা বলা যায় এবং মরস্ কোডে সংবাদ দেয়া-নেয়া করা চলে। ৫-ওয়াট ভিএইচএফ ওয়াকি-টকি সেটে পাঁচ মাইলের মধ্যে খবর দেয়া নেয়া চলে। এগুলো পাঠানো হয় ৫০টি। তাছাড়া দেড় ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়াকি-টকি পাঠানো হয়। এগুলো দুই মাইলের মধ্যে অনুরুপ কাজে লাগে। সদ্য দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশেও যোগাযোগের কাজ এগুলো দিয়েই শুরু হয়। যুদ্ধের সময় আমাদের মুক্তিবাহিনীর সদস্যবৃন্ধ এগুলো গ্রামে-গঞ্জে, পাহাড়ে-জঙ্গরে ব্যবহার করেছেন.......। এসব সরঞ্জাম পেয়ে তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী রেজাউল হাসানকে লিখিত এক চিঠিতে এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নতুন ফর্দ পাঠান।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বোস্টন প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ছিল গৌরবজনক, তাকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। ডাঃ রেজার উৎসর্গ, ড. আলম, কাজী বেলাল, খায়রুল ও অপু আসাব, সালমা খায়ের, খোরশেদ আলম, আমিনুল ও আমিরুল ইসলাম, ড. আলমগীর, ড. বিনয় পাল ও শ্যামলী পাল, রেজাউল হাসান, তৈয়ব উদ্দিন মাহতাব, শেখ ওহ্হাব, হায়াত ইমাম- এঁদের সবার অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্মরণীয়।

খায়রুল আসাব জানান- তিনি তাঁর স্কলারশীপের অর্ধাংশই মুক্তিযুদ্ধ তহবিলে দান করেছেন। বোস্টনের বাঙালিদের কর্মতৎপরতার কারণেই মুক্তি সংগ্রামের সময় এখানে এসেছিলেন এম আর সিদ্দিকী, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, এএমএ মুহীত ও ড. আনিসুর রহমান।

বোস্টনের বাঙালিরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এদেশে জনমত গঠনে যে সক্রিয় ভূমিকা নেন তার নজির রয়েছে কেনেডি-বোক রেজুলিউশনে, হার্ভাডের বিখ্যাত ম্যাসন প্রবন্ধে। তাঁদের আর্থিক সাহায্য ও পাঠানো সরঞ্জাম মুক্তিযুদ্ধের সহায়তা করেছে। বোস্টনের বাঙালির এই গৌরবজনক ভূমিকা ও অবদান ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরা স্বাধীন বাংলার সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার, এমনকি ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের আগেই গঠন করেছেন *নিউ ইংল্যান্ড বাংলাদেশ সমিতি-* ৫ই মার্চে।

মুক্তিযুদ্ধে বোস্টন প্রবাসী বাঙালির অবদান আজও অলিখিতই রয়ে গেছে বলা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থ প্রণয়ন আবশ্যক।

সুলেখক সৈয়দ মোস্তফা কামাল ড. মোমেনের বেশ কিছু প্রবন্ধ,কবিতা ও তাঁর কর্মবহুল জীবনের অলিখিত উপখ্যান সংকলিত করেছেন তার.......

ড. এ-কে আব্দুল মোমেনঃ প্রবাসে স্বদেশ চিন্তা

গ্রন্থে। গ্রন্থখানি বেশ সুখপাঠ্য।

রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত বইটি পাওয়া যাবে নিউ এমদাদিয়া পাবলিকেশন্স ৩৪/১, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকায়

হরতাল- ধর্মঘট ও রাজনৈতিক দায়িত্বহীনতা

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুয়েষ্ট অঙ্গরাজ্য স্পিরিট অব আমেরিকা বা **Conscience of the World** নামে সমধিক পরিচিত। অত্র ষ্টেটে সর্বপ্রথম শুরু হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম **No taxation without representation** অত্র ষ্টেটে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা উচ্চতর ডিগ্রি দিয়ে থাকেন। এখানেই রয়েছে শিক্ষার পাদপীঠ হার্ভাড, এম. আই. টি. নর্থ-ইষ্টার্ন, টাফট্, বষ্টন, ব্রেনডাইজ, সীমন, এম-হাষ্ট, স্মিথ, ওলেস্‌লি, ব্যাপসন প্রমুখ স্বনামখ্যাত শিক্ষালয়। বৃহত্তর বষ্টন নগরীর অন্যতম আয় হচ্ছে শিক্ষা থেকে। বিশ্বের হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা প্রতিবছর এ ষ্টেটে আসে শিক্ষা অর্জনের জন্যে। বস্তুতঃ বৃহত্তর বষ্টনের প্রতি তিনজন মধ্যে দুজন ছাত্র আর একজন শিক্ষক। ছাত্র শিক্ষকের এক নিপুণ সমাজ গড়ে উঠেছে অত্র অঙ্গরাজ্যে। এ রাজ্যের জনপ্রতিনিধি ও ছাত্র-শিক্ষক বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন ১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিলে। হার্ভাডের তিনজন শিক্ষক লেখেন .. "ইমার্জেন্স অব এন ইনডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ উল বি রিয়েলিটি"

শোভা যাত্রার খেসারতঃ

১৯৯০ সালে এ রাজ্যের ডেমোক্রেটিক গভর্ণর মাইকেল ডুকাসিককে পরাজিত করে নির্বাচিত হলেন রিপাবলিকান দলের উইলিয়াম ওয়েল্ড। তার স্ত্রী সুজান ওয়েল্ড হচ্ছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোজবেল্টের নাত্‌নী। কয়েক দশক পর রিপাবলিকান দল জয়লাভ করে। নতুন গভর্ণর এ্যাডুকেশন এর উপর নির্ভরশীল ম্যাসাচুচেষ্ট ষ্টেটের সরকারী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বাড়িয়ে দেন, শিক্ষকদের বেতন কমিয়ে দেন এবং কয়েক হাজার শিক্ষকদের ছাটাই করার সুপারিশ করে আইন সভায় প্রস্তাব রাখেন। তার প্রস্তাবের প্রতিবাদে অত্র অঙ্গরাজ্যের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা ষ্টেট হাউজে শোভাযাত্রা করে স্বারকলিপি পেশ করেন। কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক ষ্টেট হাউজে আসেন এবং ঐ সমস্ত লোকের ভীড়ে ষ্টেট হাউজের আঙ্গিনাস্থ ফুলের চারা গাছ ও বাগান নষ্ট হয়ে যায়।

এই খবর প্রকাশ হওয়ার পর সাধারণ নাগরিক, ছাত্র-শিক্ষক ও শোভাযাত্রা আয়োজকরা উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-ছাত্রীদের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্দ হয়ে ওঠেন এবং মিডিয়ার কারনে ফুলের চারা গাছ ও বাগান মুখ্য হয়ে ওঠে। ছাত্র-শিক্ষকের ন্যায্য দাবী-দাওয়া গৌণ হয়ে পড়ে। নাগরিকরা দাবী করেন যে, যারা সমাবেশের আয়োজনে ছিলেন তাদের নিজ খরচে ফুলের বাগান পূনর্বাসন করতে হবে এবং শোভাযাত্রার জন্য যদি কোন শিক্ষক নিজেদের ক্লাশ ছুটি দিয়ে থাকেন তাহলে সেই শিক্ষকদের সে সব ক্লাশ পূরণ করে দিতে হবে এবং তার জন্য কোন অতিরিক্ত বেতন বা ভাতা তারা নিতে পারবেন না। **NEA** (ন্যাশনাল এডুকেটার্স এসোসিয়েশন) এবং **MSCA** (ম্যাসাচুচেষ্ট ষ্টেট কলেজ এসোসিয়েশন) এর আয়োজনে ছিলেন, তারাই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। কিছু সংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-ছাত্রী ফুলের বাগান নষ্ট করায় যারা শোভাযাত্রার নেতৃত্বে ছিলেন তারা নিজ নিজ পদবী থেকে ইস্তফা দেন এজন্য যে, তারা শোভাযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন যার ফলে জনগনের করের টাকায় সৃষ্ট ফুলের বাগান নষ্ট হয়েছে। প্রতিটি যোগদানকারী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা এসে বাগানটি আবার সাজিয়ে দেন। এদিকে নিয়ম-শৃংখলা লঙ্ঘন করায় স্থানীয় কোর্ট আয়োজনকারীদের জরিমানা করেন। শোভাযাত্রার উদ্যোগকারীগন তখন নিজেদের মধ্য থেকে অতিরিক্ত চাঁদা সংগ্রহ করে কোর্টের জরিমানা প্রদান করেন।

ধর্মঘট হচ্ছে শেষ অবলম্বনঃ

যুক্তরাষ্ট্রে যখন কোন ইউনিয়ন বা প্রতিষ্ঠান ধর্মঘট বা কাজে বিরতি ঘোষনা করেন তখন শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন হলে উদ্যোক্তাদের সে খরচ বহন করতে হয়। এমনকি যদি কোন অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি আয়োজন করেন তাহলে স্থানীয় পুলিশদের ভাড়া দিয়ে অত্র অনুষ্ঠানে নিতে হয়। যারা হরতালের কারণে ঘন্টা প্রতি হিসাব করে পুলিশের খরচ উদ্যোক্তাদের যোগাড় করতে হয়। তাছাড়া ধর্মঘটের কারণে যে সমস্ত কর্মচারী নিজেদের বেতন হারাবেন তাদের সংসার চালানোর জন্যে আয়োজকদের ভাতা দিতে হয়। কেউ ধর্মঘট করলে বা কাজ থেকে বিরত থাকলে তাকে কখনই বেতন দেয়া হয় না। সুতরাং যারা ধর্মঘট আহবান করেন তাদের বহু বিবেচনা করে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নতুবা আইন মেতাবেক উক্ত সংস্থাকে এবং সংস্থার নেতৃত্বকে বহু টাকা গচ্ছা দিতে হয়। ধর্মঘট হচ্ছে লাষ্ট রিজর্ট এসব করণে উন্নত দেশে ধর্মঘটের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তাছাড়া ধর্মঘট করে কোন সংস্থা সাধারণ নাগরিকের জীবন-যাত্রা বিঘিœত করতে পারবে না।

পরাধীন মানসিকতা এখনো সোচ্চারঃ

বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন কার্যকরী আইন না থাকায় মর্জি মাফিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিজেদের দলীয় বা ব্যক্তি স্বার্থে কিংবা ছলে-বলে কৌশলে ক্ষমতা দখলের জন্য হর-হামেশা ধর্মঘট, হরতাল আহবান করে থাকেন। এমন মন-মানসিকতা পরাধীন দেশের মত। হরতাল, ধর্মঘটের সময় যে সমস্ত বাড়ি,গাড়ি জ্বালানো হয় বা নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করা হয় তার জন্য আহবানকারী সংস্থা বা দল কোন খরচ বা জরিমানা প্রদান করে না। তার ফলে যখন তখন জাতীয় সম্পদ,গাড়ি,বাড়ি জ্বালানো হয়। যারা হরতালের কারণে কাজ থেকে বিরত থাকেন তাদের ঐ দিনের বেতন কাটা হয় কিনা জানি না। তবে ধর্মঘট আহবানকারীদের, ক্ষতিগ্রস্থদের ঐ সময়ের পাওনা বেতন বা আয় দিতে হয় না। হাজার হাজার রিকশা চালক যারা ক্ষতিগ্রস্থ হন তাদেরকে কোন রাজনৈতিক সংস্থা বা দলীয় নেতা ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু টাকা দিয়েছেন কিনা জানি না। দেশের সম্পদ বিনষ্টের জন্য আজ স্বদেশে রাজনৈতিক দায়িত্বহীনতা চরমে পৌঁছেছে।

মিডিয়ার দায়িত্বঃ

সংবাদপত্র সমূহ ও জাতীয় টেলিভিশন মিডিয়া দেশের সম্পদ বিনষ্ট করা যে অত্যন্ত অন্যায় এবং গর্হিত অপরাধ তা জনসমক্ষে তুলে ধরেন না। কোথায় কটি গাড়ি জ্বালানো হলো, কোন লোক জ্বালিয়েছে, ঐ দলের বা গ্রুপের নেতৃত্বে কে বা কারা ছিলেন, তাদের নাম, ঠিকানা, বড় বড় হরফে ছাপানোর দায়িত্ব মনে করেন না। বষ্টনে যারা ফুলের চারা ও বাগান নষ্ট করেছিলো তাদের প্রত্যেকের ছবি টেলিভিশন নিউজে বার বার দেখানো হয় এবং জনগন তাদের ধিক্কার দেয়। তাছাড়া, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ক্রিমিনাল কেস্ ও করা হয়।

হরতাল বিষয়ক আইন প্রয়োজনঃ

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেশের সম্পদ নষ্ট করার উস্কানী দেয়, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা দলকে সম্পদ নষ্ট করার জন্য জরিমানা করা উচিৎ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সরকার ও বিরোধীদল উভয়কে অনুরূপ আইন সংসদে পেশ করে পাশ করা উচিৎ। সংসদে এ বিষয়ে প্রচুর আলোচনা দরকার এ জন্য যে, তাতে দেশের জনগন এ বিষয়ে সজাগ হবেন। প্রতিবছর ধর্মঘট, হরতাল ও অনুরূপ ধ্বংসাত্বক কর্মকাণ্ডের জন্য দেশ কিভাবে প্রতিবছর গরীব হচ্ছে, সম্পদ হারাচ্ছে,

প্রতিবছর তাদের করের বোঝা কিভাবে বাড়ছে এবং উন্নয়ন কর্মসূচী বা বৈদেশিক বিনিয়োগ বিঘিন্ত হচ্ছে তা জনগনকে তথ্যভিত্তিকভাবে জানানো দরকার।

বন্যা ও ধর্মঘট ঃ

সাম্প্রতিক বন্যার জন্য বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৪.৩ বিলিয়ন ডলারের মতো। দেশের আহবানে সাড়া দিয়ে আজ পর্যন্ত সর্বমোট ২৩৭ মিলিয়ন ডলার সাহায্য এসেছে বলে জানা যায়। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলার জন্য সরকার ১৫% সারচার্জ সংগ্রহ করেছেন। সৌদি আরবে বসবাসরত সকল বাংলাদেশী প্রবাসী নাগরিকদের কাছ থেকে পাসপোর্ট নবায়ন ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত ১০রিয়াল সংগ্রহ করা হচ্ছে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরসনের জন্য। প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্নভাবে টাকা সংগ্রহ করেছেন দেশমাতৃকার জন্যে। তাদের সমূহ প্রচেষ্টায় যে টাকা উঠবে তা সাম্প্রতিক ধর্মঘটের প্রথম প্রহরেই খরচ হয়ে গেছে। তিনদিনের ধর্মঘটে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের সম্পদ নষ্ট হয়েছে বলে সরকার জানিয়েছেন।

কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য নেইঃ

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্ধ হর-হামেশা দাবী করেন যে, তারা জনগনের মঙ্গল চান, দেশের উন্নয়ন চান। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, তাদের হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইত্যাদির ফলে দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিঘিন্ত হয়, মানুষের হয়রানির শেষ নেই। হরতাল, ধর্মঘট করে দেশের রাজনীতিবিদরা দেশটিকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে এসেছেন যে তার ফলে বাংলাদেশের জনগনের ক্রয় ক্ষমতা প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের তুলনায় কয়েক গুন কম বেড়েছে। ২৫০ মিলিয়ন বা ১০ মিলিয়নই হোক, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা দল এবং যে সব নেতৃত্বের জন্য দায়ী তাদের যদি দেশের প্রতি সামান্যতম দরদ ও দেশভক্তি থাকে তাহলে তাদেরকে এই দূর্যোগের সময়ে সেই সম্পদ পূরণ করে দেয়া উচিৎ। নচেৎ তাদের রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়া প্রয়োজন। দেশের উন্নয়নের নামে অবনতি ঘটানো মোনাফেকির নামান্তর। অন্য একজন আইন অমান্য করে, মানুষ হত্যা করে রেহাই পেয়ে গেছে; সুতরাং আমিও আইন অমান্য করবো, দেশের সম্পদ নষ্ট করবো, নেতৃত্বের কাছ থেকে জাতি তা আশা করে না। অন্যদল ধর্মঘট করেছে, সুতরাং আমাদেরও করতে হবে...কুকুরে কামড় দিয়েছে, সুতরাং নিজদের কামড় দিতে হবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ধর্মঘট-হরতালের রাজনীতি পরিহার করুনঃ

সরকারের নীতিমালার বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা অনুচিৎ নয়। তবে দেশের ক্ষতি করে, সম্পদ বিনষ্ট করে, জনগনের জিল্লাতি বাড়িয়ে প্রতিবাদ করা নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য নয়। এ দেশ নিজের, এ দেশের প্রতিটি সম্পদ নিজেদের-একে ধ্বংস করার অধিকার কোন রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্বকে জনগন দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমেরিকার এসইএ এবং এমএসসিএ সংস্থা সমূহের স্থানীয় নেতৃত্ব, তাদের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিলে জনগনের করের পয়সায় সৃষ্ট ফুলের বাগান নষ্ট হওয়ায় পদবী থেকে শুধু ইস্তফা দেননি বরং তারা সম্পদ নষ্ট করা যেন না হয় তার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল বা নানাবিধ সংস্থা সমূহের নেতৃত্ব এ বিষয়ে কি অনুতপ্ত ও সজাগ। তারা কি তাদের পদবীতে ইস্তফা দেবেন? ম্যাসাচুচেষ্টে সর্বমোট ক্ষতি হয়েছিলো দেড় হাজার ডলার। আমেরিকা ধনী দেশ। এর জি-ডি-পি বাংলাদেশের জি-ডি-পি থেকে ২৬১ গুণ বেশী। কিন্তু পাবলিক, সম্পদ নষ্ট হওয়ায় সোচ্চার হুংকার শুরু হয় যার ফলে একাধিক নেতৃত্ব পদে ইস্তফা দেন। বাংলাদেশের ক্ষতি হয়েছে ২৫০ মিলিয়ন ডলার। দরিদ্র দেশের জন্য এ বড় লজ্জার বিষয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এ হরতাল, এ ধর্মঘট দেশের বা জনগনের উপকারের জন্য নয়। নিছক পদ্ধতিতে ঘৃণ্য কৌশলে নিজের ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য, সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের জন্য। বর্তমান সরকার যদি দেশের জনগনের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যর্থ হয় তাহলে আগামী নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি হবে। সুতরাং ঘৃণ্য পথে দেশের সম্পদ নষ্ট করে জনগনের জিল্লাতি বাড়িয়ে ক্ষমতা দখলের হরতাল যুক্তিযুক্ত কি?

মিছকিনের রাজাঃ হায়রে! হতভাগা দেশঃ

মোটকথা, ধর্মঘট, হরতাল, শোভাযাত্রায় রাজনীতি পরিহার করে, দেশ গড়ার রাজনীতি গ্রহণ অপরিহার্য। তা না হলে বাংলাদেশ যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। আজ বিশ্বের প্রতিটি দেশ উন্নয়নের আস্বাদ গ্রহণ করেছে। আর বাংলাদেশ বিশ্বের দশতম বৃহৎ দেশ হয়েও চির-অবহেলিত, মিছকিন নামে পরিচিত। তাদের জাতীয় জীবনে শুধু রয়েছে হরতাল, ধর্মঘট, বন্যা, সাইক্লোন আর দারিদ্রের হাহাকার। তাদের নেতা-নেত্রীরা ব্যক্তিগত চিকিৎসা ও ধর্মীয় অনুকাজে আসেন সৌদি আরবে খয়রাতির টাকায় নিজেদের মান-সম্মান-লজ্জা, লজ্জা-শরম সব জলাঞ্জলি দিয়ে মিছকিনের রাজা হিসাবে।

আর এদিকে লক্ষ-কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ নষ্ট করে ধর্মঘট আহ্বান করেন। জাতি কি থু-থু দেবে এদের মুখে?

দায়িত্বশীল নেতৃত্ব প্রয়োজনঃ

যারা সরকারে আছেন আর যারা সরকারের বাহিরে আছেন তাদের জেনে রাখা ভাল যে, বহুদলীয় গনতান্ত্রিক সভ্য রাষ্ট্র সমূহে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে সার্বক্ষণিক বাক-বিতণ্ডা হয়। কিন্তু জাতীয় সম্পদকে বিনষ্ট করার ক্ষমতা কারো নেই। যুক্তরাজ্যের বিরোধী দলীয় কন্‌জারভেটিভ পার্টি বা যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী দলীয় রিপাবলিকান পার্টি যদি শোভাযাত্রা আহ্বান করে একটিও গাড়ি জ্বালায় কিংবা পথচারীদের স্বাভাবিক চলাফেরার অসুবিধা সৃষ্টি করে তাহলে প্রবল মিডিয়ার চাপে তাদের ক্ষমা চাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। আর ক্ষতিপূরণতো দিতেই হবে। তাদের আইন পরিষদের সদস্যরা এভাবেই আইন সৃষ্টি করেছেন।

বাংলাদেশের যে সমস্ত দল বা প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে ধর্মঘট বা হরতাল আয়োজন করে জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট করা হচ্ছে সেই দলকে ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিৎ। সেই সাথে জনগনের কাছে তাদের ক্ষমা চাওয়া উচিৎ এবং করজোড়ে প্রতিজ্ঞা করা উচিৎ যে তারা আগামীতে যাতে দেশের সম্পদ নষ্ট না হয় তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। একই সাথে নিজের দলের যে সমস্ত সদস্য বা নেতা শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সম্পদ নষ্ট হয়েছে, তাদের চিহ্নিত করে দল থেকে বহিস্কার করা উচিৎ। তবেই তারা নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকতে পারেন। নচেৎ তাদের রাজনীতি থেকে দেশের ও দশের সাফল্যের জন্য অবসর নেওয়া প্রয়োজন। জাতীয় মিডিয়া এ ব্যাপারে তৎপর হলে দেশের অনেক সম্পদ হরতাল ও ধর্মঘটের কারনে বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাবে বৈ কি। দেশের জন্য আজ দরকার দায়িত্বশীল নেতৃত্বের রাজনীতিতে, মিডিয়াতে, শিক্ষাঙ্গনে সর্বত্র।

বাংলাদেশ ও আমেরিকা
দুই দেশে দুই নিয়ম

বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে মিলের চেয়ে গড়মিলই বেশী। ও দেশের বার্ষিক মাথাপিছু আয় প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) ডলার। ও দেশে লোকে ডানে গাড়ি চালায়, বাংলাদেশে বায়ে। ওখানে কোথাও গাড়িতে হর্ণ বাজায় না! কিন্তু বাংলাদেশে গাড়ির হর্ণের আওয়াজে মাথা যায় বিগ্‌ড়ে। ওখানে আপ করলে বাতি জ্বলে, ডাউন করলে বাতি নিভে যায় বা বন্ধ হয়- বাংলাদেশে তার উল্টো। ওখানে যে আগে আসবে সে আগে দাঁড়াবে- তার কাজ হবে আগে। নোবেল লোরেট, গভর্ণর, কংগ্রেসম্যান- সবাইকে একই নিয়ম মানতে হয়; কিন্তু বাংলাদেশে তার উল্টো। বাংলাদেশে ভি, আই, পি / ভি, ভি, আই, পি দাসত্বের মানসিকতা জাতির প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অক্টোপাসের মতো ছড়িয়ে আছে। ওখানে টি,ভি-রেডিওর নিউজ হচ্ছে নিউজ ভ্যালুর উপর নির্ভরশীল আর বাংলাদেশে পদবী ও ক্ষমতার উপর। ওখানে লোকে সহজে মিথ্যা বলে না, কাজে ফাঁকি দেয় না কিন্তু বাংলাদেশে কাজে ফাঁকি দেয়া, মিথ্যা বলা নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়ম। ওখানে প্রত্যেকে স্ব-স্ব কাজ নিয়ে ব্যস্ত, অন্যের কাজে মাথা ঘামায় কম- বাংলাদেশে নিজের কাজে মন নেই, অন্যের কাজ নিয়ে মহাব্যস্ত। ওদেশে হরতাল-ধর্মঘট নেই, অত্যাবশ্যকীয় জীবন-যাত্রায় কোন ব্যাঘাত নেই- বাংলাদেশে তার পূরো উল্টো। যখন তখন দেশটি ধর্মঘট এবং হরতালকারীদের হাতে জিম্মি হয়ে ওঠে। এক সময় বর্গীদের ভয়ে দেশবাসী পালিয়ে বেড়াতো আর এখন হরতালকারীদের ভয়ে লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া, মান-ইজ্জত নিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

সরকারী অফিস ও কর্মচারীঃ

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী কর্মচারীদের প্রভাব হচ্ছে নূন্যতম- রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব হচ্ছে সর্বোচ্চ। সকল ধরণের সিদ্ধান্তের উত্তরাধিকার হচ্ছেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। যেমন ধরুন, শহরের প্রধান হচ্ছেন নির্বাচিত মেয়র। তিনি পুলিশ, স্কুল সুপারিনটেন্‌ডেন্ট বা অন্যান্য সকল কর্মচারীর নিয়োগ বেতন নির্ধারণ ও বরখাস্তের সিদ্ধান্তের অধিকারী। শহরের টাকা কীভাবে এবং কি কি বাবদে খরচ হবে তার সিদ্ধান্ত নেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা- গভর্ণর, প্রেসিডেন্ট বা মেয়র নয়। গভর্ণর, প্রেসিডেন্ট বা মেয়র সুপারিশ করতে পারেন, প্রস্তাব পেশ করতে পারেন, তবে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। বাংলাদেশে তার উল্টো।

যুক্তরাষ্ট্রের সব অফিসেরই বড় সাহেব হচ্ছেন নির্বাচিত ব্যক্তি বা পলিটিক্যালী এপয়েন্টেড......... কোন ব্যক্তি বিশেষ। যতোদিন মেয়র সাহেব বা গভর্ণর সাহেব বা প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর গদিতে থাকবেন ততোদিন ওনার ইচ্ছার উপর তাঁর চাকুরীও থাকবে। যেদিন ওনি চলে যাবেন, সেদিন অফিসের বড় বড় সাহেবদেরও চলে যেতে হবে। বাংলাদেশে তার বিপরীত-মন্ত্রী-মিনিষ্টার, মেয়র চলে যেতে পারেন, সরকারী কর্মচারী নির্ঘাত থাকবেন। তার সরকারী চাকুরি চিরস্থায়ী কেউ তা নিতে পারবে না। বরং বাংলাদেশে সরকারী চাকুরি পাওয়া যতো কঠিন তার চেয়েও অনেক গুণ কঠিন হচ্ছে চাকুরি যাওয়া। যুক্তরাষ্ট্রে যেহেতু অফিসের বড় সাহেব রাজনৈতিকভাবে নিযুক্ত সেজন্য তিনি তার সরকারের সময়ে সমূহ উন্নতি যাতে হয়, জনগন যাতে অসন্তুষ্ট হয়ে তার সরকারের বিরুদ্ধে ভোট না দেয়, তার জন্য তিনি দিন-রাত খাটেন। তার সময়কালে যাতে অত্র বিভাগের সমূহ উন্নতি হয় তার জন্য তার প্রচেষ্টার অন্ত নেই।

জনগনের করের টাকা যাতে অপচয় না হয় তাতে তিনি সদা সচেষ্ট। যেমন ধরুন- ম্যাসাচুচেষ্ট অঙ্গরাজ্যে যদি আপনি সরকারী চাকুরি করেন তাহলে অফিসের ফোন থেকে নিজ বাসায় ফোন করলে প্রথমতঃ তার খরচ আপনাকেই দিতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ যতক্ষণ ফোন করছেন ততো মিনিটের বেতন আপনার বেতন থেকে কাটা যাবে এজন্য যে, জনগনের পয়সায় চাকুরি করার সময়ে বাড়ির কাজে সময় নষ্ট করা নিষিদ্ধ। এমনকি যদি বাড়ি থেকে অফিসে ফোন আসে তাহলে ঐ ফোনে যতক্ষণ আলাপ করেছেন ততক্ষণের বেতন কাটা যাবে। সরকারী গাড়ি বা কোন কিছুই নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না। বাংলাদেশে তার সম্পূর্ণ উল্টো। জনগনের টাকার বাড়ি, গাড়ি, ফোন, সম্পদ সবই যথেচ্ছ ব্যবহার করা শুধুই সরকারী কালচার নয়, অনেকটা যেন পৈত্রিক সম্পত্তি।
যুক্তরাষ্ট্রে যদি কোন ব্যাংকার আইন বহিঃর্ভূতভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষকে অধিক ঋণ প্রদান করেন এবং ঐ ব্যক্তি ঋণ খেলাপী হয়, তাহলে তার চাকুরী যাবে। বাংলাদেশের একজন রাজনীতিবিদের ছেলেকে হঠাৎ করে বাংলাদেশের ব্যাংকাররা ১০ কোটি টাকা ঋণ দেন- ঐ ব্যাংকারদের চাকুরী যায়নি তাতে শুধু সরকারের বদনাম হয়েছে। অর্থ্যাৎ বাংলাদেশে “ননডিভিজ্যুয়াল রেসপনসিবিলিটি” নেই ঢালাওভাবে দোষারোপই মুখ্য। গেল ১৬ই অক্টোবরে যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত ইকোনোমিষ্ট ম্যাগাজিনে চাকুরীর জন্যে একটি নোটিশ বেরিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, কানাডার টরেন্টো ও ব্রাজিলের সাও পোলোর জন্যে দুজন কনসাল জেনারেল এবং ভারতের বোম্বে এলাকার জন্য একজন ডেপুটি হাই কমিশনারের চাকুরী খালি হবে।

যে কোন ব্রিটিশ নাগরিক ঐসব চাকুরির জন্যে দরখাস্ত করতে পারবেন।

এতোদিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সব পর্যায়ের চাকুরীর জন্যে এমন দরখাস্থ আহবান করা হতো- যুক্তরাষ্ট্রের ডিপ্লোমেটিক মিশনে বা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যারা উচ্চ পদবীতে চাকুরি করেন, তাদের প্রায় ৮০% ভাগ অনুরূপ ভাবে নিযুক্তক্যাডার সার্ভিসের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বাংলাদেশে তার সম্পূর্ণ উল্টো- সরকারী চাকুরী, সেটা দেলে হোক আর বিদেশে হোক- সবগুলোই ক্যাডার সার্ভিস থেকে হতে হবে।মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ব্রিটিশ জাতের কাছ থেকে আমরা অনুরুপ ক্যাডার সর্বস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহন করেছি। তাদেরও চিত্র বদল হচ্ছে- আমরা মোটেই বদলাইনি। বদলানোর জিন্তাও করছি না। তার ফলে স্বদেশের আমলাতন্ত্র বা সরকারী দপ্তরসমূহ ইনইফিসিয়েনসির বা অদক্ষতার আঁধার হয়ে উঠেছে। যে কোন সরকারের পক্ষে এইরুপ কর্মচারী দিয়ে দেশ শাসন সহজ নয়।

বাংলাদেশের আই. জি বা পুলিশ কমিশনার পুলিশ থেকে হবেন

বাংলাদেশের প্রচলিত নিয়মে পুলিশের আই. জি বা জেলার পুলিশ কমিশনার পুলিশের অফিসারদের মধ্যে থেকেই হয়ে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রে এর পুরো উল্টা। বষ্টনের নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি নতুন পুলিশ কমিশনার নিয়োগকরবেন। সারা দেশ জুড়ে দরখাস্তের জন্য আহবান জানান- যে কোন আমেরিকান নাগরিক বা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট দরখাস্থ করতে পারবেন। দরখাস্থ কারীদের মধ্যে থেকে তিনজনকে বাছাইকরা হয়। এদের একজন হচ্ছেন উকিল, একজন হচ্ছেন অধ্যাপক এবং অন্যজন একটি বড় শহরের বর্তমান পুলিশ কমিশনার। উকিলও অধ্যাপক কোন দিন পুলিশের চাকুরী করেননি। শহরের বিভিন্ন এলাকায় তাদের জন্যে বক্তৃতা ও প্রশেন্াত্তর দেয়ার জন্যে আয়োজন করা হয়। স্থানীয় রেসিডেন্ট তাদের প্রশ্ন করেন তারা পুলিশ কমিশনার নিয়োজিত হলে কী কী করবেন, কি ভাবে ক্রাইম দূর করবেন ইত্যাদি। অতঃপর প্রত্যেক রেসিডেন্ট যারা সভায় উপস্থিত ছিলেন তারা তাদের রেটিং কাগজে লিখে বাক্সে রেখে যান। মেয়র সাহেব সবচেয়ে বেশী পয়েন্ট পান তাকে পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করেন। যিনি নিয়োজিত হলেন তিনি হচ্ছেন একজন আইনজীবি। যিনি এরপূর্বে কখনও পুলিশের চাকুরি করেননি। আমাদের দেশে বর্তমান মন-মানসিকতায় তা কল্পনাতীত।

বাংলাদেশের গর্ব হচ্ছে বাংলাদেশী আমেরিকান নাগরিক জনাব ওসমান সিদ্দিক। তিনি এশিয়ার প্রথম এবং মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি আমেরিকার রাষ্ট্রদূত নিয়োজিত হয়েছেন। তার পূর্বে এশিয়ার কোন ব্যক্তি বা কোন মুসলমান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হননি। তিনি পেশাজীবি হিসেবে একজন ক্ষুদ্র ট্র্যাভেল এজেন্ট। কিন্তু তার মেধা ও প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা থাকায় তিনি রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। বিশ্বের যতো সফলকামী বড় বড় কূটনীতিক রয়েছেন যেমন ধরুন- হেনরি কিসিঞ্জার, প্রফেসর গলব্রেথ, উইলি ব্রেন্ট, কিং হোসেন (জর্ডান), কিং হাসান (মরক্কো), ইয়াসির আরাফাত, জন হলব্রোক প্রমুখ এরা কেউই ক্যাডার ডিপ্লোমেট নন।

বাংলাদেমের মন্ত্রী আর আমেরিকার মন্ত্রীর রিয়াদ সফর ঃ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আমেরিকার বানিজ্যমন্ত্রী অক্টোবর মাসে এক দিনের সফরে রিয়াদ আসেন। দুই জনই শুক্রবার রাতে আসেন এবং শনিবার রাতে চলে যান। আমেরিকান মন্ত্রী রিয়াদে অবস্থান কালে ১৪টি এপয়েন্টমেন্টে মিলিত হন। রাজা, উপ-রাজা, একাধিক মন্ত্রী, এমনকি সৌদি টেলিকম এর কর্মচারীবৃন্ধ এবং চেম্বার প্রতিনিধিদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশের মন্ত্রী শুধুমাত্র সউদী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আমেরিকার মন্ত্রীর সৌদি সরকারের রাজা, মন্ত্রী তাদের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ৯টায় স্থানীয় আমেরিকানদের সাথে প্রাতঃরাশে মিলিত হন।

তিনি দুই মিনিট বক্তৃতা দেন এবং বলেন, আমি আপনাদের ট্যাক্সের টাকায় সৌদি আরব এসেছি এবং আমার সাথে ১২জন ব্যবসায়ী প্রতিনিধি রয়েছেন যারা নিজের খরচে এসেছেন। আমি এদেশের সরকারের সাথে দেখা করার পূর্বে যেহেতু আপনারা অনেকদিন যাবৎ এখানে আছেন সেজন্য প্রথমে আপনাদের সাথে দেখা করে যে বিষয়গুলো আমি উথ্বাপন করতে যাচ্ছি সে সম্পর্কে আপনাদের মতামত ও সুপারিশ চাই। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও আমেরিকা সৌদি আরবের বহু পুরানো বন্ধু এই প্রেক্ষিতে আপনারা আপনাদের সুপারিশ রাখবেন, যাতে আমাদের সম্পর্ক আরো দৃঢ়তর হয়। অতঃপর তিনি যে বিষয়গুলো আলোচনা করবেন তা সবাইকে পড়ে শোনান। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কর্মচারীরা কাছে ছিলেন, কিন্তু তারা কোন বক্তব্য রাখেন নি।

অপরদিকে বাংলাদেশের মন্ত্রী-মিনিষ্টার যখন আসেন তখন প্রথমতঃ তাদের আগমন বার্তা গোপন রাখা হয়। যদি তা জানা হয়ে যায় তাহলে তাদের রাজনৈতিক দলসমূহ যাবার প্রক্কালে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন। তাতে স্থানীয় নেতারা লম্বা লম্বা বক্তৃতা রাখেন, রাষ্ট্রদূত বক্তৃতা রাখেন, মন্ত্রী সাহেব লম্বা বক্তৃতা করেন। কিন্তু কী কী বিষয়ে এদেশের সরকারের সাথে আলাপ করতে এসেছেন বা কী আলাপ হয়েছে তা কিছুই জানান না। স্থানীয় প্রবাসী বাঙালিদের কাছ থেকে সুপারিশ বা মতামত গ্রহণ করা তাদের প্রোগ্রামের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাদের হয়তো ধারণা যে প্রবাসীরা কিছুই বুঝেনা, কিছুই জানেন না। তারা আবার ডিপ্লোমেসির মারপ্যাচ কী জানে?! তারা স্বদেশে টাকা পাঠাচ্ছে, তাই নিয়ে থাকুক। তারাতো বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারী নয়, সুতরাং তারা কী ই বা বুঝে?! তা ছাড়া তাদেরতো ভোটের অধিকার নেই, সুতরাং **Just foget them.**

রিয়াদ, সউদী আরব-২০০০

বাংলাদেশ ও সৌদি আরবে ধর্মের আদব-কায়দা

বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে ইসলামের আদব-কায়দা ও অনুশীলনে যথেষ্ট সুক্ষ্ম তফাৎ রয়েছে। বাংলাদেশে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে ১২ই রবিউল আউয়াল উদ্‌যাপন, মৃত্যুর পর চল্লিশা করা বা কাঙ্গালী ভোজের আয়োজন করা, পীরফকিরের সাগরেদ হওয়া, মাজারে মোমবাতি দেয়া, শবে-বরাত পালন, ফাতেহা ইয়াজদাহম পালন, ওরশ মোবারক, মিলাদ-মাহফিল বা ওয়াজ-নসিহত করা সাধারণত হয়ে থাকে। সঙ্গত কারনেই এগুলো সৌদি আরবে মোটামোটিভাবে নিষিদ্ধ। এদেশের কোথাও ভারতবর্ষের মতো বা বাংলাদেশের মতো রাস্তা দখল করে বা মসজিদে মাইক্রোফোন ব্যবহার করে ওয়াজ-নসিহত বা মিলাদ মাহফিল হয় না। বরং এগুলো কেউ করতে গেলে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে জেলে দিতে পারে। সৌদি আলেমদের মতে, রসুল (সঃ) ১২ই রবিউল আউয়াল উদ্‌যাপন করতে মানা করেছেন। দেশে শিখে এসেছি যে রসুল (সঃ) এর জন্ম ও মৃত্যু উভয় দিনই হচ্ছে ১২ই রবিউল আউয়াল। এখানে এসে জানলাম যে, তাঁর মৃত্যু দিবস হচ্ছে ১২ই রবিউল আউয়াল, তবে জন্মদিবস কোনদিন সে সম্পর্কে কোন সহি তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সৌদি আরবে ১২ই রবিউল আউয়াল বা সবেমেরাজ, ১০ই মহররম বা আশুরার জন্যে কোন সরকারি ছুটি দেয়া হয় না। এদেশে শুধু দুটো ঈদের ছুটি দেয়া হয়। ধর্মানুগ হলেও এদেশে ধর্মাচারে কোনো বাড়াবাড়ি নেই।

নামাজ: এদের পদ্ধতি অনেক সহজ

এদেশের অধিকাংশ লোক মসজিদে নামাজ পড়ে। এতে নাকি ২৭ গুণ বেশি নেকি পাওয়া যায়। এদের মতে, রসুল (সঃ) ঘরে একাকী নামাজ পড়া অপছন্দ করতেন, জামাতে পড়তেই আদেশ করেছেন। ফরজ নামাজ মাইকে পড়া হয়। আজানও মাইকে হয়। তবে ফরজ নামাজ শেষ হলেই মাইক বন্ধ। ধর্মের ওয়াজ-নসিহত মাইকে হয় না কারণ এর ফলে অন্য লোকের অসুবিধা হতে পারে। যতক্ষণ ফরজ নামাজ হয় ততক্ষণ সকল দোকান-পাট, অফিস-আদালত বন্ধ থাকে।

ফরজ শেষ হলেই দোকান-পাট, অফিস-আদালত চালু হয়। আমাদের দেশে তা নেই বললেই চলে। আমাদের দেশে অনেকেই নামাজের জন্যে ঘন্টাখানেক বিরতি নেন, সৌদি আরবে যা ১০/১৫ মিনিট মাত্র।

জামাতের নামাজ সংক্ষিপ্ত হয় :

এদেশের প্রতিটি মহল্লায় মসজিদ আছে এবং একই মসজিদে মূল জামাতের পরও জামাত হয়। দেরীতে আসার কারণে যারা প্রথম জামাত মিস করেন তারা সাথে সাথেই নতুন জামাত শুরু করেন। যে কেউ ইমামতি করেন এবং যিনি একামত দেন, প্রায় ক্ষেত্রে তিনিই ইমামতি করেন। এদেশে সুরা ফাতেহা পড়া শেষ হলেই মোক্তাদিরা উচ্চস্বরে আমীন উচ্চারণ করেন। আমাদের দেশে এটা নীরবে করা হয়। এদেশে ইসলামিক বিধান অনুযায়ী দুজনে জামাত করে নামাজ পড়া অবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি যোগ দিলে ইমাম হেঁটে সামনে চলে যান (যদি জায়গা থাকে) নতুবা মোক্তাদি হেঁটে পেছনের সারিতে চলে যান যাতে নতুন ব্যক্তি এক কাতারে দাঁড়াতে পারেন। নামাজ চলাকালে যদি কোনো ব্যক্তি সামনের কাতার থেকে চলে যান তাহলে পাশের বা পেছনের কাতার থেকে নামাজীরা হেঁটে এসে সে স্থান পূরণ করেন কেবলামুখী হয়ে।

টুপি পরা ধর্মের অপরিহার্য অংগ নয় :

আমাদের দেশে টুপি আছে কিনা তা নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অহেতুক বাধ্য-বাধকতা করা হয়। এদেশে এর কোন বালাই নেই। অনেক সময় কর্তব্যরত পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্য বুট জুতা পরে নামাজ পড়তে দেখা যায়। কোন কোন ইমাম চামড়ার মোজা পরেও নামাজ পড়ান। এদেশে ঈদের নামাজ হয় ফজরের পরপরই। রেডিও, টিভিতে আমাদের দেশের মতো অতিরিক্ত ঘটা করে বিশেষ ঈদ উৎসব পালিত হয় না। আমাদের দেশে ঈদ উপলক্ষে দৈনিক পত্র-পত্রিকা কয়েকদিনের জন্য বন্ধ থাকে। দুনিয়ার কোন দেশে এমনটি হয় না। খৃষ্টানদের দেশে বড় দিন উপলক্ষেও পত্র-পত্রিকা বন্ধ থাকে না।

মসজিদে নিয়মিত কোরআন পাঠ:

ছোটবেলায় জেনেছিলাম যে, আছরের নামাজের পর বা মাগরিবের তিন রাকাত ফরজ নাামাজের আগে সুন্নত নামাজ পড়া যাবে না। এ দেশে প্রায় প্রত্যেক মসজিদে ঢুকেই দুই রাকাত সুন্নত পড়ে। আমাদের রসুল (সাঃ) নাকি এভাবে পড়তেন। আমাদের দেশে আজানের প্রায় সাথে সাথেই মাগরিবের নামাজ শুরু হয়। এদেশে প্রতিটি আজানের প্রায় ১৫ মিনিট পর ফরজ নামাজ শুরু হয় বা জামাত শুরু হয়। তারপূর্বে মসজিদে পৌঁছলে লোকেরা প্রথমতঃ ২ রাকাত সুন্নত পড়ে এবং বাকি সময় সাধারণত কোরআন তেলওয়াত করে। এদেশের প্রত্যেক মসজিদে শত শত কোরআন শরিফ থরে থরে সাজানো থাকে। মসজিদে গিয়ে অনেকেই কোরআন পাঠ করেন।

সফরের নামাজ:

এদেশে সফরের সময় শুধু যে নাামাজ ছোট করা হয় তা নয়, এমনকি একই সাথে দু-তিন ওয়াক্তের নামাজ একসাথে পর পর আদায় করা হয়। যেমন ধরুন গাড়িতে চলেছে কেউ-জোহরের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। নিকটবর্তী কোথাও থেমে জোহরের ৪ রাকাতের পরিবর্তে ২ রাকাত কসর শেষ করেই আছরের ৪ রাকাতের পরিবর্তে আরও ২ রাকাত কসর নামাজ পরপর আদায় করে সফরের দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশে এমনটি বিশেষ চোখে পড়েনি।

তারাবির নামাজ:

তারাবির নাামাজ এদেশে সাধারণত ৮ বা ১০ রাকাত পড়া হয়। রিয়াদ শহরের কয়েক শত মসজিদের মধ্যে শুনেছি শুধু গুটিকয়েক মসজিদে ২০ রাকাত তারাবি হয়। তবে মক্কা এবং মদিনা শরিফে সব সময় ২০ রাকাত তারাবি হয়। কোন কোন মসজিদে যেখানে খতম তারাবি হয় সেখানে ইমাম সাহেবরা হাতে কোরআন শরিফ নিয়ে তা থেকে দেখে দেখে নামাজ পড়ান এবং বহু মোক্তাদি কোরআন হাতে নিয়ে ঈমামের সাথে নীরবে তা পড়ে থাকেন। বাংলাদেশে এমনটি কখনো দেখিনি।

তাছাড়া রমজান মাসের শেষ দশদিন গভীর রাতে কিয়ামের নামাজ হয় এবং ঐ নাামাজে এক এক রাকাতে প্রায় এক এক সিপারা শেষ করা হয়। এসব নামাজে অনেকে নরম মোজা পরে নামাজ পড়েন কারণ প্রতি রাকাতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

এদেশে আমাদের দেশের মতো প্রত্যেক মসজিদে জুম্মার নামাজ হয় না। নির্দিষ্ট জামে মসজিদগুলোতে কেবল জুম্মার নামাজ হয়। এদেশে সূর্যগ্রহণ হলে গ্রহণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কখনো ঘন্টা দু-তিনেক নিয়ে দুই রাকাত নামাজ জামাতে পড়া হয়। আমাদের দেশে সূর্যগ্রহণে নামাজ পড়ার বিধানটা অগ্রাহ্য বলে মনে হয়।

নামাজের অন্যান্য কটি বিষয়:

এদেশে অজুটাকে অনেক সহজ মনে হয়। এরা হাত মুখ ধোয়, তবে পায়ে জুতা-মোজা থাকলে কখনও শুধুমাত্র মাসেহ্ করে নেয়। ছোট বেলায় আরবীতে নামাজের নিয়ত মুখস্ত করতে আমাদের বাধ্য করা হতো। তখন জানতাম যে, নিয়ত আরবীতে না করলে নামাজ হবে না। এদেশে নিয়ত উচ্চারণে কড়াকড়ি নেই-আল্লাহ্ পাক সর্বজ্ঞানী ও সর্ব-ইন্দ্রিয়। তিনি মনের কথাও জানেন। সুতরাং যে মসজিদে এসেছে সে নামাজ পড়তেই এসেছে। আল্লাহ তা জানেন।

আমাদের দেশে নামাজ শেষ হলে ঈমাম সাহেব প্রথমে ডানে সালাম ফিরান, মোক্তাদিরাও সাথে সাথে ডানে সালাম ফিরান, বাঁয়ে ফিরালে মোক্তাদিরা তাই করেন। এদেশে ঈমাম ডানে-বাঁয়ে সালাম ফিরানো সম্পূর্ণ শেষ হলে মোক্তাদিরা প্রথমে ডানে ও পরে বাঁয়ে সালাম ফিরান

দোয়ার বাধ্যবাধকতা নেই:

আমাদের দেশে নামাজ পড়া শেষ হলেই ঈমাম সাহেব সবাইকে নিয়ে হাত তুলে মোনাজাত করেন। এদেশে ঈমাম সাহেব মোনাজাত করেন না। কারণ নামাজই দোয়া। সুরা ফাতেহা-ই সবচেয়ে উত্তম দোয়া।

আদব-কায়দা: মন্ত্রী এলেও দাঁড়ায় না

এদেশে সবাই একে অপরকে সব সময় সালাম দেয়। কেমন আছো জিজ্ঞেস করলেই বলবে-আলহামদুলিল্লাহ্। যিনি হাতের ডানে রয়েছেন, তিনিই প্রথম যাবেন। বুড়ো বা জোয়ানের পার্থক্য নেই। আমাদের দেশে মিটিং-এর আগে বা মিটিং চলাকালে আফিসের কর্তাব্যক্তি বা মন্ত্রী সাহেব উপস্থিত হলে সবাই দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান দেখান। এদেশে এটা চোখে পড়েনি। কারণ আল্লাহ্র নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মজলিসে এলে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান দেখাতে বারণ করেছেন। ইসলামের বক্তব্য হলো-আল্লাহ্ ছাড়া সম্মানের প্রাপ্তি কারো নেই।

মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ:

এদেশে কারো মৃত্যু-সংবাদ এলে ঐ বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত হয়ে নীরবে কোরআন শরিফ পড়বে। চিৎকার দিয়ে কান্না এরা পছন্দ করে না। এরা মৃত্যুটাকে খুব সহজে গ্রহণ করে। কোনো আক্ষেপ নেই। বলে-আল্লাহ্ দিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই ভালোর জন্য নিয়ে গেছেন, তিনি সর্বজ্ঞানী।

বিয়ে-শাদী: পর্দা

এদেশের বিয়ে-শাদীতে পুরুষ ও মেয়েরা আলাদা আলাদা বসে। এদেশের মহিলারা পুরুষদের সামনে ঘোমটা দিয়ে চলে। চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। অনেকের চোখ ও দেখা যায় না *আবায়া* বা বোরকার কারণে। তবে অন্দর মহলে বা মহিলাদের সামনে এরা স্বল্প পোষাকে চলে।

এখানে শবে বরাত পালিত হয় না:

এ দেশের লোকজন *শবে বরাত* পালন করে না। তাহলে আমরা কোথা থেকে ধর্মীয় সংস্কৃতি পেয়েছি যে, শবে বরাতের রাতে সারারাত সজাগ থেকে মাজারে মোমবাতি ও জিয়ারত করার অনুশীলন শিখলাম? অনেকের ধারণা ভারতবর্ষের মুসলমানরা এটা সংগ্রহ করেছে হিন্দুদের *দেওয়ালি পূজা* থেকে।!

পীর ফকির মাজার এরা শিরক মনে করেন:

এদেশে পীর ফকির নেই, মাজার নেই। এরা পীর ফকিরের মুরিদ হওয়া *বিদআত* মনে করে। কারণ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ গ্রহণীয় নয়। এদেশে রসুল (সাঃ) আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) এর রওজা মোবারক মদিনায় নববি মসজিদে সংরক্ষিত আছে। তবে অন্য কারো কবর এরা বাঁধাই করে না এবং চিহ্ন ও রাখে না। এরা মাজার অপছন্দ করে। এদেশে পীর ফকির নেই এবং এরা মনে করে পীর ফকিরের সাহায্য চাওয়া, বিশেষ করে মাজারে গিয়ে কিছু চাওয়া শিরক।

হজ্ব ও হাজী-আলহাজ্ব লেখা অন্যায়:

আমাদের দেশে একটি প্রচলিত রীতি আছে যে, কেউ হজ্বব্রত পালন করলে তাকে হাজ্বী বা আলহাজ্ব বলা হয়। তাদের নামের আগে আলহাজ্ব লিখা হয়। সৌদি আরবে কেহ আলহাজ্ব বা হাজ্বী লিখে না। এরা বলে লোক দেখানোর জন্যে হাজী বা আলহাজ্ব লিখলে তার হজ্ব সহি হবে না। এটা ইসলাম বিরোধী। হজ্ব হচ্ছে মুসলমানদের সর্বশেষ রোকন। যারা শারিরীকভাবে এবং আর্থিকভাবে সক্ষম তাদের জন্যে জীবনে একবারই হজ্ব করা

অর্থ্যাৎ আল্লাহ্‌র অতিথি হিসাবে অবস্থান করা ফরজ। রসুল (সাঃ) জীবনে একবারই হজ্ব করেছেন। যদি বাহবা অর্জনের জন্যে হজ্ব করা হয় তাহলে তা হজ্ব হয় না। কারণ শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যে হজ্ব ফরজ করা হয়েছে। সুতরাং এদের মতে নামের আগে হাজী বা আলহাজ্ব লেখা যুক্তিযুক্ত নয়।

সৌদি আরব ইসলামের পাদপীঠ। যারা এক আল্লায় বিশ্বাস করে, পরকালে বিশ্বাস করে, ধর্মকে নিজের স্বার্থে বিক্রি করে না। এবং সৎকর্মশীল তারা সবাই বেহেশতে যাবে। এরা পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোন ধরনের রীতিনীতিকে যেমন পীরের সাগরেদ হওয়া, মাজারে বাতি বা শিরনী দেয়া, ইত্যাদিকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করে না। কোরআনে বর্ণিত আছে- কিতাবধর্মী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা বিনম্রচিত্তে বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, তোমদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে (তাহার প্রতি) ও তাহাদের প্রতি যাহা নাজেল হইয়াছে (তাহার প্রতি) যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন-সমূহ স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে না, তাহাদের জন্যে রহিয়াছে তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে পুরস্কার (সুরা বাকারা)।

আমাদের দেশে ধর্মের আদব-কায়দা ও অনুশীলন মূলত এসেছে বাগদাদ ও পারস্যের রাজা-বাদশাহ্‌ বা আরব বনিকদের মাধ্যমে। ইসলাম ধর্ম প্রচারে অতি স্বল্প-সংখ্যক আলেমই আমাদের দেশে এসেছিলেন এবং এ কারণেই আমাদের অনুশীলনের সাথে কিছুটা পার্থক্য দেখা দেয়।

মহান আল্লাহ্‌ সুবহানা তায়ালার মহিমা বোঝা বড় কঠিন, বিনম্র ও স্বজ্ঞানী না হলে। আমাদের দেশে অনেক সময় ধর্মের অহংকারে আমরা স্বজ্ঞান ও বিনয়ীভাব হারিয়ে ফেলি এবং এর ফলে অজ্ঞতা আমাদের অহংকারী করে তোলে। সম্প্রতি দেশীয় বাংলা পত্রিকায় প্রকাশ যে, দেওয়ানবাগ পীর সাহেব চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, যদি আল্লাহ্‌ ও রসুল (সাঃ) কে দেখাতে না পারি তবে দেশ ছেড়ে চলে যাব। তিনি বলেন, আমি কোর্সের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্‌ ও রসুল দেখার ব্যবস্থা করি। (বাংলা পত্রিকা, ১৪ জানুয়ারী ২০০০) নাউজুবিল্লাহ্‌।

মহান আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ সত্যিকারভাবে অনুশীলন না করায় আমরা বিপথগামী হয়ে ধর্মের খোলস নিয়ে হুংকার দিয়ে থাকি। তাই আজ স্বদেশে প্রয়োজন সত্যিকার ধর্মীয় শিক্ষার। সৌদি আরবস্থ প্রবাসী বাংলাদেশীরা এ কাজে এগিয়ে আসতে পারেন বৈকি!!

মণীষী উপাখ্যান

শিশু -কিশোর বন্ধুদের জন্য

সে অনেক দিন আগের কথা। স্কটল্যাণ্ডের এব দরিদ্র কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করছিলো। হঠাৎ সে শুনতে পেলো একটি শিশুর করুণ কান্না আর কাকুতি। কাছে দিয়ে দেখলো পাশের গোবর ও লতাপাতার পচা ডোবাতে একটি ৮/১০ বছরের বালক ভয় ও উদ্বেগে আড়ষ্ট হয়ে আছে। কৃষকটি কোনভাবে তাকে সেখান থেকে তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলো। ছেলেটি তখন মৃতপ্রায়। ছেলেটিতে কেউ চিনে না জানে না। ঠাণ্ডায় তার চেহারায় সবুজাভ রেখা পড়ে গেছে।

কিছুদিন পর সেখানকার এক অতি ধনবান ও প্রভাবশালী বড়লোক *নোবলম্যান* এক বিরাট অশ্বসজ্জিত গাড়িতে সোয়াড় হয়ে সেই কৃষকের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। ইনি হচ্ছেন ডোবায় কুড়ে পাওয়া বালকের বাবা। তিনি দরিদ্র কৃষককে এক বস্তা মুদ্রা দিয়ে বল্লেন, ছেলেকে বাঁচিয়েছ সেজন্যে এ সামান্য উপহার তোমার জন্য। যদি তুমি ইহা গ্রহণ করো তাতে আমি খুবই খুশি হবো। দরিদ্র কৃষক উত্তরে বললো- মহামান্য, আমাকে মাফ করবেন, আমি এ উপহার গ্রহন করতে পারবো না। আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করেছি। *নোবলম্যাল* এর ছেলে বয়সী কৃষকের ছেলেটি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের কথোপকথন শুনছিলো। তার গায়ে জীর্ণবস্ত্র, চোখে-মুখে নিদারুণ দারিদ্রের ছাপ।

কৃষকটি যখন কোনভাবেই *নোবলম্যান* এর উপহার নিতে চাচ্ছিলো না, তখন তিনি ঐ দরিদ্র ছেলেটিকে বল্লেন, দেখো হে কৃষক, তুমি দরিদ্র। তুমি তোমার ছেলেকে পড়াশোনা করাতে পারছো না। তা আমি বুঝতে পারছি। যখন তুমি আমার এতোবড় উপকার করলে মানে আমার ছেলেকে বাঁচালে আমি তার প্রতিদান হিসেবে তোমার ছেলেকে ইংল্যাণ্ডের সর্বোত্তম স্কুলে পড়ানোর দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দাও।

কৃষক তাতে রাজী হয়ে গেলো। দরিদ্র কৃষকের ছেলে তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ট স্কুলগুলোতে পড়াশুনা করে পরবর্তীতে নামকরা ডাক্তার হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন পেনিসিলিন এর আবিস্কারক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং।

দরিদ্র বাবার মতো তিনিও সারা জীবন মানুষের উপকার করে গেছেন। তবে ডোবাতে পড়ে থাকা মৃতপ্রায় সেই ছেলেটি কে তোমরা কি জানো ? পরবর্তীতে তিনিই হচ্ছেন ব্রিটেনের অন্যতম শ্রেষ্ট প্রধানমন্ত্রী *নোবল লোরেট* স্যার উইনষ্টন চার্চিল। পরিনত বয়সে যখন তিনি নিমোনিয়া রোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হন তখন তাঁর বন্ধু স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং তাকে পেনিসিলিন ইন্‌জেকশন দিয়ে সুস্থ করে তোলেন।

মরুপলাশ এর এবারের নিবেদন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেন এর প্রবন্ধ গ্রন্থ । সুপ্রিয় পাঠক আমাদের ওয়েবসাইট এ সকল সাহিত্য ম্যাগাজিন ও গ্রন্থ নিয়ে আপনিও আলোচনা, সমালোচনা লিখতে পারেন । আমরা আপনার **মতামত** আমাদের ওয়েবসাইটের **মতামত** কলামে প্রকাশ করবো । বাংলা কিংবা ইংরেজি দুই ভাষাতেই লিখতে পারেন ।

E-mail: marupalash@yahoo.com

ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেন একজন ইনফরমেটিভ প্রবন্ধকার হিসেবেই দেশে বিদেশে বিশেষ করে রিয়াদের বাঙলা সাহিত্যাঙ্গনে সুপরিচিত। তাঁর প্রবন্ধ পরিচর্যায় সচরাচর আমরা লক্ষ্য করে থাকি বাংলাদেশের সরকারী নিয়মনীতিতে অব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে সুষ্ঠু পরিকল্পনা বিষয়ক সুপারিশমালার সাদৃশ্য। শিশু বন্ধুদের জন্য এই লেখাটি ডঃ মোমেনের একটি ভিন্ন মাত্রার লেখা। লেখাটি মরুপলাশ প্রিয়দের কাছে ডঃ মোমেন এর পরিচয়কে নতুন মাত্রায় সংযোজন করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

যবনিকা